সর্বস্তরে বিজ্ঞান প্রসার

বিজ্ঞান অন্বেষক

বর্ষ -২২
সংখ্যা-২
মার্চ-এপ্রিল ২০২৫
মূল্য : ২০ টাকা

ISSN 2582-5674
RNI : WBBEN/2003/11192

www.bigyananneswak.org.in
whts : 7980121478/9143264159

এশিয় হাতি
Asian Elephant
Elephas maximus
ছবি : রাজা রাউত

এই সংখ্যায়

❑ সুন্দরবনের ফিশিং ক্যাট ❑ অপেক্ষবাদ ❑ সিরাম ব্যারাম ❑ মৌল'র নামকরণ উৎস ❑ চন্দ্রায়নের নতুন পর্ব ❑ অঙ্ক ❑ ম্যানগ্রোভ ❑ আরল সাগর বিপর্যয় ❑ মুক্ত হোক নদী ❑ পরিবেশ ❑ ঝাড়ুগাছ ও প্রজাপতি উদ্যান।

বিপন্ন বন্যপ্রাণ

ছবি : রাজা রাউত

লাল পান্ডা
Red Panda
Ailurus fulgens

বাংলার বাঘ
Royal Bengal Tiger
Panthera tigris tigris

পারা হরিণ বা বরা হরিণ
Indian Hog Deer
Axis porcinus

মেছো কুমির
Marsh Crocodile
Crocodylus palustris

কৃষ্ণসার মৃগ
Black Buck
Antelope cervicapra

ভারতীয় নেকড়ে
Indian Wolf
Canis lupus pallipes

বিজ্ঞান অন্বেষক

সম্পাদক

প্রবীর বসু

সম্পাদকমণ্ডলী

জয়দেব দে, বিজয় সরকার, শিবপ্রসাদ সরদার, চন্দনসুরভি দাস, দীপাঞ্জন দে, অমিতাভ চক্রবর্তী, অনিন্দ্য দে, রতন দেবনাথ, পান্না মানি, অনুপ হালদার, সুবিনয় পাল, তুষার কান্তি নাথ, শতাব্দী দাশ, সোমা বসু, অর্চন সমাজদার, উজ্জ্বল কান্তি রায়, রিঙ্কু দাস, মোহা: গোলাম হামজা (রাহুল), কিঞ্জল বিশ্বাস

উপদেষ্টামণ্ডলী

শঙ্করকুমার নাথ, দীপককুমার দাঁ, সিদ্ধার্থ নারায়ণ জোয়ারদার, বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ গাঙ্গুলী, প্রকাশ দাস বিশ্বাস, রাজা রাউত, তপন দাস, মানসপ্রতিম দাস, সুমিত্রা চৌধুরী, জয়শ্রী দত্ত, সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, তপন সাহা, সৌমেন বিশ্বাস, সমীর নাগ

: website :
www.bigyananneswak.org.in/
ssu2011.com/bigyananneswak
e-mail :
bigyanannesak1993@gmail.com.
Mobile & Whatsapp No.
9830676330 / 9143264159/7980121478

প্রচ্ছদ বিন্যাস ও পরিকল্পনা

টিম বিজ্ঞান অন্বেষক

সুভাষিতম

"চোখের সামনে মানুষ অনাহারে মরবে, ব্যাধি-জরা-মহামারিতে উজার হয়ে যাবে আর দেশের মানুষ চোখ বুজে ভগবান ভগবান করবে এমন ভগবৎ প্রেম আমার নেই, আমার ভগবান আছে মাটির পৃথিবীতে। স্বর্গ চাই না, মোক্ষ চাই না, বারে বারে যেন ফিরে আসি এই মর্ত্য বাংলায়।"

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

সূ চি

বিপন্ন উত্তরের বন্যপ্রাণ : শুভময় খান কর্মকার ২

পথের অধিকার : বন্যপ্রাণ ও প্রগতি : রামজীবন ভৌমিক ৬

জলবায়ুর পরিবর্তন : সুন্দরবনের ফিশিং ক্যাট : শুভদীপ মুখোপাধ্যায় ও সৈকত কুমার বসু ৯

সাধারণ অপেক্ষবাদের বিশেষ তাৎপর্য : বরুণ কুমার দত্ত ১৩

মৌল'র নামকরণের উৎস : অসিত ঘোষ ১৫

সিরাম ব্যারাম : অসীম বসাক ১৭

চন্দ্রায়ণের নতুন পর্ব : কৌশিক রায় ২০

সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ : রণজিৎ পাল ২২

বিজ্ঞানমনস্ক মানবতাবাদী ধর্মের প্রসার : সিদ্ধার্থ জোয়ারদার ২৩

জীবিত পুত্রিকা : ভবানীপ্রসাদ সাহু ২৪

ম্যানগ্রোভ অরণ্য কি সুন্দরবনের রক্ষাকর্তা? : প্রবীর বসু ২৫

মুক্ত হোক নদী : সৌমেন বিশ্বাস ২৬

প্রজাপতি উদ্যান : জয়শ্রী দত্ত ২৭

আরল সাগর বিপর্যয় : তরুণ রায়চৌধুরী ২৮

ঝাড়ুগাছ : জয়শ্রী দত্ত ২৯

অংক : ট্যালি মার্ক : সোমা সরকার ৩০

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান : শ্রীমতী রিংকু দাস ৩১

মোটর ইঞ্জিন চালিত ভ্যান : দ্যুতি সরকার ৩২

ISSN 2582-5674

9 772582 567004

বিজ্ঞান অন্বেষকের পক্ষে জয়দেব দে, ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক প্রকাশিত এবং স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।

অক্ষর বিন্যাস : রেজ ডট কম, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

যোগাযোগ : ৭৯৮০১২১৪৭৮/৯২৩১৫৪৫১৯১/৯৪৩২৩৩৫৮৮২/৮৯৪৪৯৯৬৭৫৫/৭০০১৩৩৭৭১৪/৮২৪০২৪৪৩২৩

প্রচ্ছদ কথা ১

শু ভ ম য় খা ন ক র্ম কা র

বিপন্ন উত্তরের বন্যপ্রাণ

সারাংশ : পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অংশের ৮টি জেলা নিয়ে গঠিত উত্তরবঙ্গ জৈববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ একটি ভৌগোলিক এলাকা। বর্তমানে এখানকার বন ও বন্যপ্রাণ ভীষণভাবে বিপন্ন। একাধারে বাসস্থান ধ্বংস তার সাথে সাথে খাদ্যের অভাব ও চোরাশিকারীদের উপদ্রব ভয়াবহ অবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছে এখানকার বন্যপ্রাণকে। চোরাশিকারীদের হামলায় একের পর এক বন্যপ্রাণীর মৃত্যু হচ্ছে। পাচার হচ্ছে বন্যপ্রাণীর দেহাংশ। সংরক্ষিত বনাঞ্চলেও আজ বন্যপ্রাণীরা পুরোপুরি নিরাপদ নয়। বিভিন্ন কারণে বন্যপ্রাণীদের সাথে মানুষের সংঘাত বেড়ে উঠছে। বন্যপ্রাণীদের চলাচলের করিডোরগুলি আজ মানুষের বসতি, হোটেল রিসোর্ট এবং চাবাগানের চাপে অবরুদ্ধ। রেলপথ, সড়কপথে বন্যপ্রাণীদের মৃত্যুর ঘটনা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। এই সংকটের সমাধান কোন পথে তা নিয়ে সকলকে একযোগে ভাবতে হবে।

ভারতবর্ষের পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি অঙ্গরাজ্য হল পশ্চিমবঙ্গ। অসাধারণ প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে ভরপুর আমাদের এই রাজ্য। উত্তরবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের একটি ভৌগলিক অঞ্চল। রাজ্যের উত্তর অংশের আটটি জেলা নিয়ে উত্তরবঙ্গ গঠিত। উত্তরবঙ্গ বলতে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান নদী গঙ্গার উত্তর অংশকে বোঝায় যা জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, কালিম্পং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা এই আটটি জেলার সমষ্টি।

শকুন

রাজ্যের উত্তরাংশ অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ জৈব বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ একটি এলাকা। ভৌগোলিকভাবে এই অঞ্চলটি দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চল ও ডুয়ার্স সমভূমি অঞ্চল দ্বারা গঠিত। উত্তরবঙ্গের একটা বৃহৎ এলাকা (দার্জিলিং, ডুয়ার্স, তরাই অঞ্চল) ভারতবর্ষের চারটি জীববৈচিত্র্য হটস্পট এর অন্যতম পূর্ব হিমালয়ের অন্তর্গত একটি জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ অঞ্চল।

উত্তরবঙ্গ অরণ্য সম্পদে সমৃদ্ধ একটি অঞ্চল। এখানে বনভূমির মোট আয়তন ৩০৮৬ বর্গ কি.মি.। পাহাড়ে পার্বত্য বনভূমি বাকিটা সমতলের জঙ্গল। উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন উচ্চতায় নানান প্রকারের বনাঞ্চল আছে। এখানে মোট পাঁচটি জাতীয় উদ্যান, সাতটি অভয়ারণ্য এবং একটি ব্যাঘ্র প্রকল্প আছে।

বিভিন্ন কারণে উত্তরবঙ্গের অমূল্য বন ও বন্যপ্রাণ আজ ভীষণভাবে বিপন্ন। ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গের ১৬টি স্তন্যপায়ী প্রজাতির প্রাণী IUCN International union for the Conservation of nature and natural resources) এর Red data book বা বিলুপ্ত ও বিপন্ন প্রাণীর তথ্য সমন্বিত

লাল পাণ্ডা

পুস্তকে নাম লিখিয়েছে তাদের বিপন্নতার জন্য। অরণ্য প্রকৃতির অমূল্য সম্পদ। পরিবেশে নির্মল বিশুদ্ধ অক্সিজেন যোগান দেওয়ার সাথে সাথে ভূমিক্ষয় রোধ, বৃষ্টিপাত ঘটানো ও বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে বন। বহু প্রজাতির বন্যপ্রাণীর আশ্রয়স্থল এই বন। বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মতো উত্তরবঙ্গেও নির্বিচারে বন ধ্বংস চলছে। হারিয়ে যাচ্ছে বন্য প্রাণীদের আশ্রয়স্থল। বিপন্ন হচ্ছে বহু প্রজাতির জীব।

লাল পান্ডা (Red panda) অত্যন্ত বিরল প্রজাতির প্রাণী। এদের প্রাকৃতিক শিকারি মূলত মেঘ চিতা হলেও মানুষ এদের আবাসস্থল ধ্বংস করে ও কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে শিকার করে দেহাংশ পাচার করে এদের বিপন্ন করে তুলেছে। বাসস্থান সংকোচন এবং খাদ্যের অভাবে রেড পান্ডা বিপন্ন প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে। এছাড়া লোমশ চামড়ার লোভে চোরাশিকারীদের উপদ্রব এক বড় সমস্যা। পরিবেশ দূষণের ফলেও এদের প্রজনন ক্ষমতা কমে যাচ্ছে।

উত্তরবঙ্গে বাঘ একরকম বিলুপ্তির পথে। উত্তরের জঙ্গলে একমাত্র বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকায় ও নেওড়া ভ্যালি জাতীয় উদ্যানে বাঘের উপস্থিতির

বাইশন

চিহ্ন পাওয়া গেছে। উত্তরের জঙ্গলে বাঘের অনুপস্থিতির কারণে ভারতীয় বাইসন বা গাউরের মত বড় তৃণভোজীর সংখ্যা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বিনষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে এদের লোকালয়ে আগমন ও মানুষের সঙ্গে সংঘাত ক্রমশ বেড়েছে।

পূর্বে উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলে বিশেষ করে বক্সায় বুনো মোষ দেখা গেলেও বর্তমানে আর দেখা যায় না। এক সময় উত্তরবঙ্গের নদীতে ঘড়িয়াল দেখা যেতো, বর্তমানে উত্তরবঙ্গ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বড় নদীতে পূর্বে গাঙ্গেয় শুশুক (Gangetic Dolphin) দেখা যেত,বর্তমানে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এরাও উত্তরবঙ্গ থেকে হারিয়ে গেছে। উদবিড়াল (Smooth coated otter) জলাভূমি ও নদীতে বাস করে। উত্তরবঙ্গে এদের সংখ্যা কমতে কমতে এরা আজ বিলুপ্ত হতে বসেছে। হিমালয়ের কালো ভাল্লুক (Asiatic Himalayan Black Bear) উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলে ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে পড়ছে। শ্লথ ভালুকও তেমন আর দেখা যায় না। ভারতীয় চিতাবাঘ উত্তরের জঙ্গলে নানা কারণে আজ

কালো ভাল্লুক

বিপন্ন। মেঘ চিতা, তুষার চিতা উত্তরবঙ্গে লুপ্তপ্রায়। বুনো কুকুর ঢোল (Dhol) উত্তরের জঙ্গলে লুপ্তপ্রায় প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। উত্তরের গর্ব ভারতীয় একশৃঙ্গ গন্ডারও আজ ভীষণভাবে বিপন্ন।

চোরাশিকারীদের হামলায় একের পর এক বন্যপ্রাণীর মৃত্যু হচ্ছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জঙ্গলে। সংরক্ষিত বনাঞ্চলগুলিতেও বন্যপ্রাণীরা এখন আর নিরাপদ নয়। চোরা শিকারিদের লোভ অনেক প্রাণীর অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে। পৃথিবীর বেশ কিছু দেশে উত্তরবঙ্গ থেকে বন্যপ্রাণী হত্যা করে তার দেহাংশ পাচার করা হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে জীবন্ত প্রাণী পাচার করা হচ্ছে সেই সকল দেশগুলোতে। বন্যপ্রাণীর দেহাংশের মধ্যে আছে হাতির দাঁত, একশৃঙ্গ গন্ডারের খড়গ, হরিণের শিং, বাঘের চামড়া, দাঁত, নখ, হাড়, চিতাবাঘের চামড়া, সাপ ও গোসাপের চামড়া, ভালুকের চামড়া ও পিত্তথলি, সজারুর লোম, কাটা, প্যাঙ্গোলিনের আঁশ, সাপের

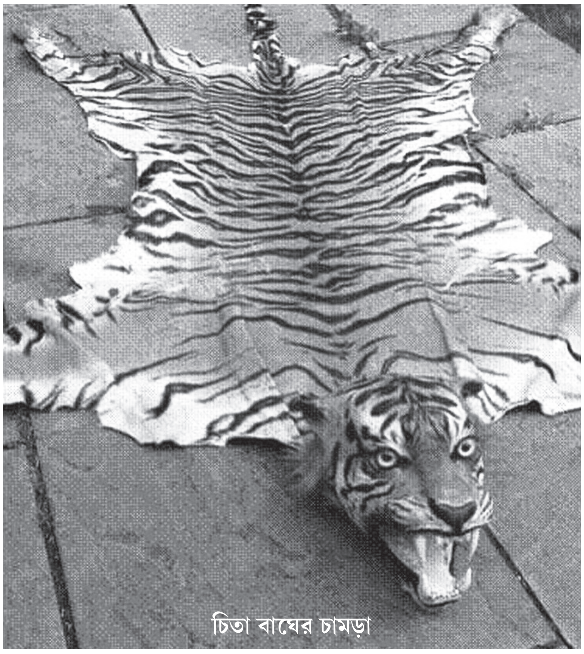

চিতা বাঘের চামড়া

বিষ প্রভৃতি। চীন সহ বেশ কিছু দেশে স্থানীয় পরম্পরাগত ওষুধ তৈরিতে এই সকল বন্যপ্রাণীর বিভিন্ন দেহাংশ ব্যবহৃত হয়। তার ফলে এই সকল দেহাংশ বিদেশের বাজারে চড়া দামে বিক্রি হয়। এইভাবে বিপন্ন হচ্ছে উত্তরের বন্যপ্রাণ। অন্ধবিশ্বাস ও ভ্রান্ত ধারণা এর পেছনে অনুঘটকের মত কাজ করে চলেছে। গোটা বিশ্বে মাদক পাচারের পরে আন্তর্জাতিক অপরাধ জগতে বন্যপ্রাণী পাচারই বড় কারবার। বিভিন্ন মাফিয়া চক্র এর সঙ্গে যুক্ত।

বন্যপ্রাণী পাচার ও ব্যবসার নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের এই অঞ্চল বারে বারে সংবাদের শিরোনামে আসছে। গত কয়েক বছরে রাজ্যে বন্যপ্রাণী নিধনের ছবিটা ভয়াবহ। উত্তরবঙ্গে চোরা শিকারীদের হাতে ইতিমধ্যে প্রান হারিয়েছে বেশ কয়েকটি গন্ডার ও অন্য প্রজাতির আরো কিছু বন্যপ্রাণ। পাচার হয়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে ধরা পড়েছে তক্ষক (Tokay Gecko), পাখি, বিরল প্রজাতির কচ্ছপ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বাঘের চামড়া, চিতাবাঘের চামড়া, হাতির দাঁত, গন্ডারের খড়গ, ভাল্লুকের পিত্তথলি প্রভৃতি। এটি একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। ভুটান সীমান্তবর্তী এলাকায় চোরাশিকারীরা অনেক সময় বন্যপ্রাণী হত্যা করে সীমান্ত পেড়িয়ে ভুটানে গিয়ে গা ঢাকা দেয়। বন পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রশাসনের উদাসীনতা এই অঞ্চলে চোরা শিকারীদের সক্রিয়তার অন্যতম কারণ।

শিকারী পাখি

বিশেষ করে দক্ষ কর্মীর অভাব ও বন সুরক্ষায় মান্ধাতার আমলের অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার এক্ষেত্রে সমস্যা আরো বাড়িয়ে তুলছে। চোরা শিকারীদের হাতের অত্যাধুনিক অস্ত্র ও শিকারের পদ্ধতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারছে না তারা। এই ধরনের অপরাধ ঠেকাতে বনকর্মীর ঘাটতি প্রসঙ্গ বারে বারে উঠে আসছে। চোরা শিকারি ও চোরাকারবারিদের হাত থেকে উত্তরের অমূল্য বন্যপ্রাণকে রক্ষা করাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ বনদপ্তরের সামনে।

পশ্চিমবঙ্গে কেবলমাত্র উত্তরবঙ্গে অবস্থিত জলদাপাড়া ও গরুমারা জাতীয় উদ্যানেই ভারতীয় একশৃঙ্গ গন্ডার পাওয়া যায়। এই দুই বনাঞ্চলে মোট দুই শতাধিক গন্ডারের বাস। এক শৃঙ্গ গন্ডার পৃথিবীর বিলুপ্তপ্রায় স্তন্যপায়ীদের অন্যতম। এদের সংখ্যা কমে যাওয়ার পেছনে প্রধান কারণ হলো চোরা শিকার। গন্ডারের খড়্গ, চামড়া প্রভৃতির আন্তর্জাতিক বাজার দর অত্যন্ত বেশি। তাই এইগুলি সংগ্রহ করার জন্য চোরা শিকারীরা

ব্যাপকভাবে গণ্ডার হত্যা করছে। গন্ডারের খড়গে একটা ঔষধি বা উত্তেজক গুণ আছে এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের জন্য চোরা শিকারীদের লোভের শিকার হয় সে। যদিও এই বিশ্বাসের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। পুরুষ এবং স্ত্রী গন্ডার দুজনেরই নাকের উপরে চামড়ার উপর গড়ে প্রায় ২৫ সেন্টিমিটার (সর্বোচ্চ প্রায় ৬০ সেন্টিমিটার) লম্বা একটা খড়গ বা শিং থাকে। গন্ডারের খড়গ কেরাটিন নামক এক ধরনের প্রোটিন দ্বারা গঠিত যা দিয়ে আমাদের নখ আর চুল গঠিত হয়। নির্বিচারে বন ধ্বংসের ফলে গন্ডারের আবাসস্থল আজ সংকুচিত। গন্ডারের বসবাস উপযোগী জঙ্গল ও জলার তৃণভূমি আয়তনে ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসায় উত্তরবঙ্গে গন্ডারের অস্তিত্ব আজ ভীষণভাবে বিপন্ন।

বনের আশেপাশের গ্রামের বা বনবস্তিবাসীদের গবাদি পশু অনেক ক্ষেত্রে জঙ্গলে প্রবেশ করে খাদ্যের জন্য। ফলে গন্ডারসহ অন্য বন্য প্রাণীরা গবাদি পশুর সংস্পর্শে এসে অ্যানথ্রাক্স এর মত ভাইরাস ঘটিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। এভাবেও বিপন্ন হয় বহু বন্যপ্রাণী। অরণ্যকে গবাদি পশুর চারণভূমি হতে দেওয়া চলবে না।

বিভিন্ন কারণে বন্যপ্রাণীদের সাথে মানুষের সংঘাত আজ অনিবার্য হয়ে উঠছে। মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাত বর্তমানে মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সকলের কাছে। কখনো লোকালয়ে হাতির হামলায় ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন সাধারণ মানুষ তো আবার কখনো লোকালয়ে বেরিয়ে প্রাণ হারাতে হচ্ছে চিতা বাঘ কিংবা অন্য বন্যপ্রাণীকে। হাতির হামলায় প্রাণ হানি যেমন ঘটছে তেমনি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন স্থানীয়রা। প্রায়শই জমির ফসল নষ্ট করছে বুনো হাতির দল। শুধু যে হাতির হামলায় মানুষের মৃত্যু হয়েছে তাই নয়। হাতির হামলা থেকে বাঁচতে মানুষের ছোঁড়া তীরের আঘাতে এবং বিদ্যুতের সংস্পর্শে এসে মৃত্যু হয়েছে বহু হাতির।

উত্তরবঙ্গে হাতির সংখ্যা যেমন বেড়েছে তার সাথে সাথে বেড়েছে জনবসতি। হাতি এক বন থেকে অন্য বনে সদলবলে বিচরণ করে তাদের

নির্দিষ্ট পথ বা করিডোর (Corridor) দিয়ে। জনবসতি এবং মানুষের চাহিদার চাপে হাতির দলের চলাচলের চিরাচরিত করিডোর গুলি আজ বিঘ্নিত। হাতির করিডোরগুলো আজ চা-বাগান, হোটেল, রিসোর্ট, মানুষের বসতি দ্বারা অবরুদ্ধ। ফলে হাতির স্বাভাবিক চলাচলের পথে বাধা পেয়ে তৈরি হচ্ছে সংঘাত।

বিভিন্ন কারণে সময়ের সাথে সাথে বনাঞ্চল সংকুচিত হচ্ছে। তাছাড়া বনাঞ্চলগুলিতে পূর্বের মতো গাছপালা আর নেই। বনের মধ্যে হাতির খাদ্যের অভাব আছে অর্থাৎ হাতির সংখ্যা বাড়লেও তাদের খাবার কিন্তু কমেছে। বনাঞ্চলে হাতির খাদ্য ও বাসস্থানের সমস্যা অনেক ক্ষেত্রে তাদের লোকালয়ে প্রবেশের কারণ হিসাবে গণ্য হচ্ছে।

বন কেটে হাতির যাতায়াতের পথে রেললাইন বসানোয় ও জনবসতি গড়ে ওঠায় উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলের এই সংঘাত আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। শিলিগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার রেলপথের ১৬৮ কিলোমিটার মধ্যে বর্তমানে ২৭ কিলোমিটার এলাকা বন্যপ্রাণীদের বিচরণ ক্ষেত্র। উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সে ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে প্রায়ই। এ ব্যাপারে হাতির মৃত্যুর দায় নিয়ে বনদপ্তর ও রেল দপ্তরের মধ্যে টানা পড়েন চলছে সুদীর্ঘ সময় ধরে। এই রেল পথে ট্রেনের ধাক্কায় বন্যপ্রাণীর মৃত্যু বন্ধ করতে সদর্থক পদক্ষেপ প্রয়োজন।

ডুয়ার্সে বিভিন্ন বনাঞ্চলের মধ্যে দিয়ে বা পাশ দিয়ে যাওয়া সড়কে তীব্রগতিতে চলাচল করা পণ্যবাহী বা যাত্রীবাহী গাড়ির ধাক্কায় মারা পড়ছে বহু বন্যপ্রাণী। এরমধ্যে বাইসন, সম্বর ও চিতা বাঘও রয়েছে। বারে বারে রক্তাক্ত হচ্ছে বন্যপ্রাণ। নষ্ট হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য। বেপরোয়া ভাবে

চলা যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনিক পদক্ষেপ খুবই জরুরী। জাতীয় সড়কে বন্যপ্রাণীর লাগাতার মৃত্যু বিকল্প সড়কের দাবিকে জোরালো করছে।

উত্তরবঙ্গের জঙ্গল সংলগ্ন চা বাগান ও গ্রামগুলিতে মানুষ ও চিতা বাঘের সংঘাতও দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। কখনো চিতা বাঘের হামলায় আহত হচ্ছে মানুষ আবার কোথাও চিতা বাঘকে পিটিয়ে অথবা বিষ প্রয়োগ করে মেরে ফেলা হচ্ছে। জঙ্গলের পরিমাণ কমতে শুরু করায় চিতাবাঘের মতো বন্যপ্রাণীদের প্রাকৃতিক খাদ্যের অভাব দেখা দিচ্ছে। ফলে এদের খাদ্যাভ্যাস অনেকটাই বদলে গেছে। এরা জঙ্গল লাগোয়া চা বাগান বা গ্রামের সীমানা থেকে ছাগল, গরু, কুকুর, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি সহজ শিকার ধরতে জঙ্গল সংলগ্ন চা-বাগান ও গ্রামগুলিতে আশ্রয় নিচ্ছে যার ফলে মানুষের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ছে।

উত্তরবঙ্গে বাইসনের সঙ্গেও মানুষের সংঘাত ঘটছে। বাইসন, অজগর থেকে বাঁদর মানুষের সঙ্গে সংঘাত চলছে যেন সকলেরই। বাঁদরের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ জঙ্গল সংলগ্ন অঞ্চলের বাসিন্দারা। প্রায়শই দলবেঁধে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে গৃহস্থের বাড়ির ফলের বাগান সাবার করে দিয়ে যায়। লন্ডভন্ড করে নষ্ট করে, ক্ষয়ক্ষতি চালায়। অনেক সময় মানুষকে আক্রমণ করে আহত করে। বানরের উপদ্রবে সর্বদা আতঙ্কগ্রস্ত থাকেন জঙ্গল লাগোয়া এলাকার বাসিন্দারা। আবার অনেক সময় মানুষের ক্ষোভের বলি হয় এই সকল বন্যপ্রাণ। এ এক ভয়ংকর সমস্যা।

উত্তরবঙ্গ পাখি বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ একটি অঞ্চল। বিভিন্ন প্রজাতির পাখির বাস এখানে। প্রকৃতির এই অনন্য সৃষ্টি আজ ভীষণভাবে বিপন্ন। একদিকে পরিবেশ দূষণ ও বিশ্ব উষ্ণায়নের মত প্রাকৃতিক সমস্যা তার সাথে সাথে তাদের স্বাভাবিক বাসস্থান ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। নির্বিচারে গাছ কাটা, বন ধ্বংস চলছে। জলাভূমিগুলিকে একের পর এক বুজিয়ে দিয়ে গড়ে উঠছে বহুতল, রাস্তাঘাট, কল কারখানা। যথেচ্ছ রাসায়নিক সার

ও কীটনাশকের ব্যবহার, পাখি শিকার, প্লাস্টিক দূষণ, মোবাইল টাওয়ারের ক্রম বৃদ্ধি পাখিদের অস্তিত্ব আরো বিপন্ন করে তুলেছে।

প্রতি বছর একটা নির্দিষ্ট সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে পরিযায়ী পাখিরা এসে আশ্রয় নেয় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায়। পরিযায়ী পাখিরাও উত্তরে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত নয়।

উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন প্রজাতির সাপ দেখতে পাওয়া যায়। তার মধ্যে নির্বিষ সাপ যেমন আছে তেমনি আছে ক্ষীণ বিষধর ও তীব্র বিষধর প্রজাতির বিভিন্ন সাপ।সাপ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও উত্তরবঙ্গে অন্যান্য বন্যপ্রাণী ন্যায় সাপের অস্তিত্বও আজ

সংকটে। জঙ্গল, ঝোপঝাড়, গাছপালা কেটে ফেলায় মাটির তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে যা সাপের পক্ষে ক্ষতিকারক। সাপের বসবাসের গর্তগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অনেক জমি পতিত জমিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। কৃষি জমিতে ব্যাপকভাবে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহৃত হচ্ছে যা সাপেদের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক। এর সাথে সাথে সাপ সম্পর্কে মানুষের অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের ফলে মানুষের হাতে প্রায়শই সাপ মারা পড়ছে। ১৯৭২ সালের বন্যপ্রাণ সুরক্ষা আইন অনুযায়ী সাপকে আইনি সুরক্ষা দেওয়া থাকলেও সাপ আজ বিপন্ন।

বিশ্বের বিভিন্ন অংশের সাথে সাথে জলবায়ু পরিবর্তনে প্রভাব পড়েছে উত্তরবঙ্গের আবহাওয়াতেও। উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির প্রকৃতি ও তাপমাত্রা অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়েছে। কখনো অতিবৃষ্টি কখনো অনাবৃষ্টি, কখনো বন্যা কখনো খরা। বর্ষায় ভারি লাগাম ছাড়া টানা বৃষ্টির ফলে সৃষ্ট প্রবল বন্যায় বিপন্ন হয় উত্তরবঙ্গের বন্যপ্রাণ। একটানা বৃষ্টিতে উপচে পড়ে ডায়না, হলং, তোর্সা, মূর্তি, জলঢাকার মতো জঙ্গল সংলগ্ন নদীগুলি। বন্যায় প্লাবিত হয় বনাঞ্চল। এর ফলে অনেক বন্যপ্রাণী ভেসে যায়, মারা যায় অথবা লোকালয়ে চলে আসে।

প্রায়শই পর্যাপ্ত বৃষ্টির অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে ডুয়ার্সের নদীনালাসহ জঙ্গলের জলাধারগুলি। ফলে গরমে সমস্যায় পড়ছে বন্যপ্রাণীরা। হাতি, বাইসন, হরিণের মত বন্যপ্রাণীরা জঙ্গলের মধ্যে প্রয়োজনীয় পানীয় জল পাচ্ছে না। জলের সন্ধানে ঘন ঘন লোকালয়ে বেরিয়ে আসছে তারা। অনেক ক্ষেত্রেই বনাঞ্চলগুলিতে পর্যাপ্ত পানীয় জলের অভাব বন্যপ্রাণীদের সংকটের কারণ হচ্ছে।

বনাঞ্চলের আশেপাশের এলাকা থেকে বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থ, কীটনাশক, ডলোমাইটের গুড়ো নদীতে মেশার ফলে জল প্রবলভাবে দূষিত হচ্ছে। সেই নদীর জল পান করার ফলে বহু বন্যপ্রাণী বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে ও অকালে প্রাণ হারাচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের ভুটান সীমান্তে অবস্থিত ভুটান পাহাড়জুড়ে যে ডলোমাইট মাইনিং গুলি রয়েছে তার সব কয়টি অবৈজ্ঞানিকভাবে তৈরি হয়েছে। পাহাড় থেকে যে নদীগুলি ডুয়ার্সে নেমে এসেছে তাদের উৎসস্থলে রয়েছে মাইনিংগুলি। ফলে ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসা অসংখ্য নদী ডিমডিমা, তিতি, রেতি, কালী,পাগলি, সুক্রিতি, হলং, হাউরি, বাংরি, জয়ন্তী, ফাসখাওয়া, পানা, মুক্তি,বানিয়া, বাসরা এবং তোরসা নদীর নাব্যতা যেমন কমেছে, তার সাথে সাথে এর জলকে করে তুলেছে বিষাক্ত। এই নদীগুলি বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প ও সংলগ্ন বনাঞ্চলগুলির মধ্যে দিয়ে অথবা পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই নদীগুলির জল বন্যপ্রাণীদের পানীয় জলের উৎস। কিন্তু নদীগুলির ডলোমাইট ও অন্যান্য বিষাক্ত বর্জ্য মিশ্রিত জল পান করতে পারছে না হাতি, বাইশন, গন্ডারসহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণীরা। ভুটান সীমান্তে অবস্থিত বনাঞ্চল বক্সা ও জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্ব আজ সংকটে। নদীগুলির বিষাক্ত জল পান করে বিপন্ন হচ্ছে বন্যপ্রাণ।

উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের পাশেই প্রতিবেশী দেশ ভুটান। সেদেশের সীমান্ত ঘেঁষে রয়েছে পাশাখা শিল্পাঞ্চল। সেখানে মূলত সিলিকন, কাচ, লোহা ও কার্বাইডের মত দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। এইসব কারখানায় উৎপন্ন বিষাক্ত বর্জ্য প্রতিদিন সমতলে চলে আসে ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসা বিভিন্ন নদীর জলে মিশে। শিল্পাঞ্চলের কার্বাইড ও অন্যান্য বিষাক্ত রাসায়নিক বর্জ্য এসে পড়ে বাসরা সহ আরো অসংখ্য নদীতে। বাসরা নদী ভুটান পাহার থেকে শুরু হয়ে পুরোটাই বক্সার জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। ফলে পাশাখা শিল্পাঞ্চলের যাবতীয় বর্জ্য বাসরা বহন করে নিয়ে আসছে। জলে রাসায়নিক থাকায় ইতিমধ্যে বাসরা থেকে হারিয়ে গিয়েছে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী। ওই বিষাক্ত জলই আবার জঙ্গলের বন্যপ্রাণীরা পান করছে। এর ফলে বিপন্ন হচ্ছে বক্সার বন্যপ্রাণ।

শহর ও গ্রামের মধ্যে থাকা ভাম, বেজি, সাপ ও শিয়ালের মতো বন্যপ্রাণীরাও আজ বিপন্ন। অনেক ক্ষেত্রে সচেতনতার অভাবে তাদের মেরে ফেলা হচ্ছে। বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় এরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এদের বাঁচাতে চাই সঠিক নজরদারি ও জনগণের সচেতনতা।

বন সুরক্ষা আইনকে লঘু করে পুঁজিপতিদের স্বার্থে অরণ্যভূমি বা অরন্য লাগোয়া অঞ্চল ব্যবহারের বিষয়ে বিতর্ক তৈরি হচ্ছে। প্রায়শই বনভূমির খুব নিকটে বহুতল ফ্ল্যাট, টাউনশিপ প্রকল্প অনুমোদন পেয়ে রূপায়িত হয়ে যাচ্ছে। জনগণের আবেদন, নিবেদন ও আন্দোলনেও এই ধরনের পরিবেশ ও বন্যপ্রাণের পক্ষে ভয়াবহ পদক্ষেপ রদ করা যাচ্ছে না। এর ফলে বন্যপ্রাণীরা আগামী দিনে আরো বেশি বিপন্ন হবে। এ ধরনের পরিবেশ বিনষ্টকারী প্রকল্পের অনুমোদনের ব্যাপারে সরকারকে আরো বেশি সতর্ক ও দায়িত্বশীল হতে হবে।

এই সংকটের সমাধান কোন পথে এ নিয়ে ভাবার সময় এসেছে। সকল প্রকার বন্যপ্রাণীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। উন্নয়নের নামে পরিবেশ বিরোধী পদক্ষেপের পরিবর্তে সুস্থায়ী উন্নয়নকে প্রাধান্য দিতে হবে। বন্যপ্রাণ প্রকৃতির অনন্য সৃষ্টি। আসুন পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রক্ষা করি উত্তরের এই অমূল্য বন্যপ্রাণ।

লেখক শিক্ষক ও পরিবেশপ্রেমী, বটতলী কে এম উচ্চ বিদ্যালয় ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

e-mail:subha123apple@gmail.com • M. 9434257723

রা ম জী ব ন ভৌ মি ক

পথের অধিকার, বণ্যপ্রাণ ও প্রগতি

সারাংশ : হাতির হানা উত্তরবঙ্গে কিছু নতুন খবর নয়। হাতির হানায় মৃত্যু অথবা কারণে অকারণে এই বন্যপ্রাণীটিকে উত্তক্ত করতেও দেখা যায় হামেশাই। কেউ আর্থমুভার দিয়ে তেড়ে যাচ্ছে হাতির দিকে, কেউবা হাতির লেজ ধরে টানছে। এই বছর ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম সপ্তাহে এইসব খবরের ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল সামাজিক মাধ্যমে। ডুয়ার্সের ডামডিম থেকে শুরু করে ফালাকাটা শহর বা সোনাপুর চিলাপাতা অঞ্চলের খবর এইগুলি। রিপোর্ট বলছে গত এক বছরে এই রাজ্যে ৯৯ জনের মৃত্যু হয়েছে হাতির হামলায়, এর ৯০ শতাংশই উত্তরবঙ্গে।

"হাতিকে স্যালুট করতে গিয়ে সিদ্দিকুল্লা রহমানের মৃত্যু"—দৈনিক সংবাদ পত্রে এই সংবাদ পড়লাম (২৪/১১/২০১৭) তারিখে। অন্তর্জালে তার টাটকা দৃশ্য। পড়ে দেখে মন বিষণ্ণ হয়ে এল। হাতি তার পূর্বপুরুষের চলাচলের পথ ফিরে পেতে মাঝে মাঝে অবরোধ, ধর্না দিয়ে বসে বিভিন্ন জাতীয় সড়কে, রেল লাইনে অথবা ফসলের ক্ষেতে।

গরুমারা জাতীয় উদ্যান ফুঁড়ে বইয়ে দেওয়া ৩১ নং জাতীয় সড়কে মহাকাল ধামের কাছে এক বৃহৎ দাঁতাল (২৩/১১/২০১৭) তারিখে বিকেল তিনটে থেকে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে দাঁড়িয়েছিল। তার দুপাশে ট্রাফিকের সারি সারি অবস্থান। এমনই এক সমাপতনে সাদিক রহমান বা সিদ্দিকুল্লা রহমানের মৃত্যু। সন্ধ্যা বা তার পর হাতির ভয়ে অতি দ্রুত জঙ্গলের জাতীয় সড়ক পার করতে গিয়ে মাঝে মাঝে যানবাহন দুর্ঘটনায় পরে। মানুষের মৃত্যুর ঘটনা এই জাতীয় সড়কে লেগেই আছে। স্থানীয় বনবাসী মানুষ হাতিকে মহাকালবাবা সম্বোধনে স্মরণ করে। হ্যাঁ, প্রতি সম্বোধনে ডানহাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার সহ। প্রকৃতি থেকে শত হস্ত দূরে থাকা শহরবাসীর কাছে হাতি এত শ্রদ্ধা বা ভয় কোনওটাই দাবি করতে পারে না। হাতি আমাদের কাছে মজা, এন্টারটেইনার মাত্র। হাতি প্রায় প্রতিদিন আত্মসম্মান সহ নিজের বাসস্থান নিজের মত করে ফিরে পেতে কোনও না কোনও বিক্ষোভ প্রতিবাদ করে। যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মিড ডে মিলের চালের ঘর ভেঙ্গে দেওয়া, মুদি দোকান গুঁড়িয়ে আটা বা ডাল নষ্ট করা প্রভৃতি। বনবাসি মানুষের ঘরদোর তছনছ করে বেঘর করে দেওয়া নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। সারা ভারতের তুলনায় উত্তরবঙ্গে এ ধরনের ঘটনার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সম্প্রতি হাতির এরকম মেজাজ মর্জির কারণ খুঁজতে গিয়ে 'ওয়াইল্ড লাইফ ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া' (Wild Life Trust Of India), 'প্রোজেক্ট এলিফ্যান্ট' এবং ইংল্যান্ডের এনজিও 'এলিফ্যান্ট ফ্যামিলি, রাইট অফ প্যাসেজ' নামক একটি ৮০০ পৃষ্ঠার গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছে। তাদের গবেষণায় হাতি চলাচলের পথ কেমন ছিল এবং এখন কেমন হয়েছে তার বিবরণ আছে।

গবেষণা থেকে হাতি মানুষ দ্বন্দ্ব কেন এমন রূপ পেল তার একটা স্পষ্ট চিত্র ফুটে ওঠে। হাতির দলগুলি সংসার পাতা, খাওয়া-দাওয়ার সামগ্রী যোগাড় করা, রাতে ঘুমানো, খেলতে যাওয়া বা চড়ে বেড়ানোর জন্য সারা বছর ৩০০ বর্গকিলোমিটার থেকে ৫০০ বর্গকিলোমিটার অরণ্য জুড়ে ঘরবাড়ি, উঠোন বা বাসস্থান চায়। শত শত বর্গকিলোমিটার বনানী ব্যাপ্ত উঠোনের নির্দিষ্ট কতকগুলি পথ দিয়েই হাতির দল এঘর ওঘর চলাচল করে। এই নির্দিষ্ট গুটিকয়েক পথকেই বলে 'এলিফ্যান্ট করিডোর' বা হাতির চলাচলের পথ। করিডোর বা হাতির চলাচলের পথগুলি বৃহৎ আয়তনের অরণ্যের সাপেক্ষে প্রশস্তে এক কিলোমিটারের কম বা সর্বোচ্চ তিন-চার কিলোমিটার হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী এভাবেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম হাতি তার করিডোরগুলি জন্মগত অধিকারে এবং স্বভাবদলিলিকৃত মালিকানায় ব্যবহার করে বেঁচেবর্তে ছিল।

মানুষ পৃথিবীর স্বঘোষিত মহান জীব (?) এসে ঘোষণা করল ও সব ওমুক (কেন্দ্রীয়) সরকারের বা তমুক (রাজ্য) সরকারের। গাছের বাড়ি, হাতির বাসস্থানের মালিক রাজা বাদশা থেকে আজ কেন্দ্রীয় বনদপ্তর, রাজ্য বনদপ্তর বা রাজস্বদপ্তর বলে ফরমান জারি হল। একবার যা মানুষের, তাতে আর কারও পাশাপাশি থাকার কোনও অধিকার নেই। ক্রমোচ্চবিন্যাস বা হায়ারার্কির ধারণায় বন্য জীব হয়ে গেল পশু অর্থাৎ নিকৃষ্ট। না আছে তার বেঁচে থাকার সভ্য অধিকার, না থাকল তার ঘরদোর উঠোন নিয়ে সংসার পাতার পরিসরের ভাবনা। আগে মানুষ, পিছে মানুষ, মাঝে মানব-পদপৃষ্ঠ সব প্রাকৃতিক জীবকুল। একরকমের প্রাকৃতিক জীব হিসেবে অপরাপর জীবকুলের সাথে পাশাপাশি থেকে মানুষ নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখবে—এটাই কাম্য ছিল। কিন্তু এই বাস্তব ধারণা থেকে দূরে সরে শুধু জীবকুল ও তার ধারক প্রকৃতির ধ্বংসের নেশাই উন্নয়ন বলে মানুষ সদর্পে ঘোষণা করছে। ভারতবর্ষ জুড়ে হাতিকে মানুষ কিভাবে উন্নয়নের পায়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে তার অনেক পরিসংখ্যান, গদ্যে ছড়িয়ে আছে "রাইট অফ প্যাসেজ" বা "একফালি পথের অধিকার" গবেষণাপত্রে। গবেষকরা জানাচ্ছেন ভারতবর্ষে ২০05 সালেই হাতির চলাচলের পথসংখ্যা ছিল ৮৮টি কিন্তু ২০১৭ সালে ১৩টি বেড়ে হয়েছে ১০১টি। হস্তিযুথ তার একটি চলাচলের পথের জন্যে বিভিন্ন

রাজ্যে বিভিন্ন আয়তনের অরণ্য ব্যবহার করে (যেমন দক্ষিণ ভারতে ১৪১০ বর্গকিলোমিটার প্রতি একটি করিডোর, উত্তরপূর্ব ভারতে ১৫৬৫ বর্গকিলোমিটার প্রতি একটি করিডোর, মধ্য ভারতে ৮৪০ বর্গকিমি প্রতি একটি করিডোর, উত্তরপশ্চিম ভারতে ৫০০ বর্গকিলোমিটার প্রতি একটি করিডোর। গবেষকদের মতে ভারতে মোট ১০১টি করিডোরের মধ্যে ২৮টি দক্ষিণ ভারতে, ২৩টি উত্তরপূর্ব ভারতে, ২৫টি মধ্য ভারতে এবং উত্তরপশ্চিম ভারতে ১১টি করিডোর আছে। সম্পূর্ণ ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে হাতির চলাফেরা করে সুস্থ জীবন যাপন করার জন্যে প্রতিদিন ৭০% করিডোর ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়ে। ২৫% পথ মাঝে মাঝে দরকার, ৫% হঠাৎ হঠাৎ।

করিডোরের বিবর্তন

আমাদের দেশে হস্তিগোষ্ঠীর বাসস্থানের উঠোন চিরে উন্নয়নের বিজয়রথ চলছে। জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক, রেলপথ, চা বাগান, কৃষিজমি তৈরি, কারখানা তৈরি—এককথায় যে যা চায়, তাই নির্বিঘ্নে ঘটিয়ে ফেলতে পারে। এভাবে গড় হিসাবে দেশের প্রতি তিনটি করিডোরের মধ্যে দুটিতেই মানুষ চাষ আবাদ শুরু করেছে। শতাংশের হিসেবে গড়ে ৬৯% করিডোর আটকে কৃষি উৎপাদন চলছে। মধ্য ভারতে ৯৬% করিডোর চাষের কবলে। রাজ্য বা জাতীয় সড়ক তৈরি করার সময় সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে তিনটি এলিফ্যান্ট করিডোরের মধ্যে দুটি করিডোর নষ্ট করেই সড়ক তৈরি করেছে। পাহাড়িপথে রেল লাইন, ক্যানাল তৈরিতে ১১ শতাংশ করিডোর নষ্ট হয়েছে। খনিজ সম্পদ আহরণ, পাহাড়ের বোল্ডার উত্তোলনের জন্য ১২ শতাংশ করিডোর ধ্বংস করা হয়েছে। আমরা গত এক দশকে প্রাকৃতিক বনজঙ্গলের ধরন ধারণ বদলে দিচ্ছি। ফলে হাতির চলার পথে উন্নয়ন

দাঁড়িয়ে হাতিকে একরকম চোখ রাঙিয়ে বাধ্য করছে তাদের চলাচলের চিরাচরিত পথ ছেড়ে দিয়ে বিকল্প পথ খুঁজে নিতে। গবেষকদের মতে হাতিরা অত্যাচারিত হয়ে তাদের বহুল ব্যবহৃত সাতটি পথে যাওয়া আসা একেবারেই স্থগিত রেখেছে। বদলে ২০টি নতুন পথ খুঁজে নিয়েছে। চারপাশ দিয়ে উন্নয়ন ধেয়ে এসে এলিফ্যান্ট করিডোরগুলির মুখ বোতলের ছিপির মত বন্ধ করে দিয়েছে। ২০০৫ সালে ১

কিলোমিটার বা তার কম পরিসরের জন্য এলিফ্যান্ট করিডোর ছিল ৪৫.৫ শতাংশ যেটা ২০১৭-তে বেড়ে হয়েছে ৭৪ শতাংশ। ১ কিমি থেকে ৩ কিমি দৈর্ঘ্যের চলাচলের পথ গত এক দশকে ১৯ শতাংশ কমে গিয়েছে। ২০০৫ সালে শুধুই বনানী আশ্রিত এলিফ্যান্ট করিডোর ছিল চব্বিশ শতাংশ, এবছর মাত্র ১২.৯০ শতাংশ। গত ত্রিশ বছরে দ্রুত গতির রেলগাড়ি হাতি করিডোর জবরদখল করে হাতি যুথের দেহের উপর দিয়ে রেলগাড়ি চালিয়ে ২৬৬টি হাতিকে পিষে মেরেছে।

উত্তরবঙ্গে হাতি ঘেটো

ভারতের মধ্যে উত্তরবঙ্গে হাতি-মানুষ সমর অবস্থা খুবই উদ্বেগজনক। উত্তরবঙ্গে তিনটি জেলা, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারে নয়টি ফরেস্ট ডিভিশনের মোট অরণ্য এলাকা ৩০৫১ বর্গকিলোমিটার। তার মধ্যে ২২০০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় প্রায় ৩০০টি হাতি বাসস্থান গড়ে তুলছে। ভারতবর্ষের মোট হাতির এক শতাংশ আছে উত্তরবঙ্গের তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চলে। মেচি নদী থেকে ভুটান আসাম সীমান্তে সঙ্কোস নদী অবধি বিস্তৃত অরণ্যে হাতি করিডোরের সংখ্যা ১৪টি। উত্তরপূর্ব ভারতের তুলনায় ভাবলে উত্তরবঙ্গে হাতি করিডোর থাকা উচিত মাত্র ২টি। উত্তরবঙ্গের এত অপরিসর অরণ্যে প্রতি ১৫০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের অরণ্য পিছু একটি করে এলিফ্যান্ট করিডোর। এই ১৪টি এলিফ্যান্ট করিডোরের মধ্যে ৮৬ শতাংশ করিডোর হস্তিযূথ প্রাত্যহিক প্রয়োজনে ব্যবহার করে। উত্তরবঙ্গের ৩৫.৭০ শতাংশ এলিফ্যান্ট করিডোর নষ্ট করে রেলগাড়ি যাতায়াত করছে। ১০০ শতাংশ করিডোরের মুখ আগলে কোন না কোন চাষ আবাদের কাজ চলছে। সর্বভারতীয় গড় ৭০%। চা-বাগান, মানুষের বসতি, রেল লাইন, জাতীয় সড়ক প্রভৃতি এলিফ্যান্ট করিডোরের উপর অদৃশ্য দেওয়াল তুলে দিয়েছে। উত্তরবঙ্গে হাতিদের স্বাভাবিক বাসস্থান অরণ্য আজ বৃহৎ মাপের জেলখানা বা প্রাকৃতিক কুঠুরিতে পরিণত হয়েছে। হাতিগোষ্ঠীকে তরাই-ডুয়ার্স জঙ্গলে ঘেটোতে (Ghetto) বন্দী জীবনযাপন করতে বাধ্য করা হচ্ছে। দিন যাচ্ছে ঘেটোবন্দী জীবন হাতি মেনে নিচ্ছে না। মানুষ ও মানুষের প্রগতির সাথে হাতির সংঘর্ষে সারা ভারতবর্ষে প্রতি বছর ১০০টি হাতি শহীদ হচ্ছে। প্রায় ৪৫০ জন সাধারণ মানুষের জীবনে আকস্মিক যবনিকা নেমে আসছে। সারা দেশের তুলনায় উত্তরবঙ্গে সাধারণ মানুষের বাৎসরিক মৃত্যুর ঘটনা

সবচেয়ে বেশি। প্রতি বছর প্রায় ৫০ জন মানুষ হাতির শুঁড়ের আছাড়ে বা পদপৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যুবরণ করছে।

হাতির করিডোর রক্ষায় পদক্ষেপসমূহ

ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেসন সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া (WCS) পক্ষ থেকে বিজ্ঞানী বিদ্যা আত্রেয় (Vidya Athreya) হাতির করিডোর রক্ষার জন্য সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা করেন। সুপ্রীম কোর্ট নয়টি হাতি অধ্যুষিত রাজ্যকে অতি জরুরি (High Alert) ভিত্তিতে ২৭টি এলিফ্যান্ট করিডোরের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্যে পুনর্বাসনের নির্দেশ দিয়েছে। হাতির করিডোর পুনর্বাসনের জন্য ২০০৩ সালে ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এনিম্যাল ওয়েলফেয়ার এবং ওয়াইল্ড লাইফ ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া যৌথভাবে ২৫.৫ একর জমি অধিগ্রহণ করে ২০০৭ সালে কর্ণাটক সরকারের হাতে তুলে দেন। রাজ্য বনদপ্তর, মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট ফরেস্ট এন্ড ক্লাইমেট

চেঞ্জ (MOEFCC), ওয়াইল্ড লাইফ অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য সংরক্ষণ সংস্থার চেষ্টায় মাত্র আটটি (৮টি) এলিফ্যান্ট করিডোরের সুরক্ষা নিশ্চিত করা গিয়েছে। সুরক্ষিত পথগুলি হাতিদের চলাচলের জন্য দ্রুত যোগ্য করে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। “রাইট অফ প্যাসেজ” গবেষক গোষ্ঠীর মতে ১২টি হাতি অধ্যুষিত রাজ্যের অরণ্যবাসীদের প্রমাণ সাইজের হাতির পুতুল তৈরি করে “গজ-যাত্রা” নামক সচেতনতামূলক পরিক্রমা বের করে মানুষ-হাতি সংঘর্ষের কারণগুলি প্রচার করা দরকার।

বনবাসী উচ্ছেদ ও হাতি

হাতিদের চলাচলের পথগুলি সংরক্ষণ খুব জরুরি। কিন্তু বনবাসী উচ্ছেদ করে সেই কাজে সফলতা লাভ আদৌ কি সম্ভব? বনবাসীরা অরণ্যের স্বাভাবিক সন্তান এবং অভিভাবকও বটে। যারা বনের বৃক্ষরাজি, পশুপাখির সাথে পাশাপাশি বেঁচে থেকে এসেছে আবহমান কাল থেকে। স্বাভাবিকভাবে বনকে রক্ষা করে নিজেরা বেঁচে আছে। সরকারি নির্দেশে এবং প্রগতি মরীচিকার চাপে পথভ্রষ্ট হয়ে তারা আজ বনের স্বতস্ফূর্ত রক্ষাকারী থাকতে পারছে না। সরকার এই ধরনের প্রাকৃতিক প্রহরীকে সরিয়ে যথেষ্ট বনরক্ষী নিয়োগ করতেও পারছে না। সরকার, বনরক্ষাকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি ও সচেতন সাধারণ নাগরিকের উচিত বনবাসীদের স্বাভাবিক বন রক্ষার জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে এলিফ্যান্ট করিডোর রক্ষার কোনও সমাধান খুঁজে বের করা। প্রচলিত প্রগতির ধারাকে লাগাম পরিয়ে কোনও বিকল্প ভাবনায় আমরা যৌথভাবে পৌঁছতে না পারলে এলিফ্যান্ট করিডোর রক্ষার আর কোনও আশা নেই।

আমাদের এখনই উচিত হাতি গোষ্ঠীদের চলাচলের পথগুলি ফিরিয়ে দেওয়া। নইলে যে অরণ্য বৃক্ষরাজির মাথায় কিরণ ছড়িয়ে সূর্য উদিত হয় সেখানে বালির চিক্‌চিক্ প্রতিফলনে সেই সূর্য অস্তমিত হবে।

লেখক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

e-mail: ramjbhowmik@gmail.com • M. 9933188054

বিজ্ঞান অন্বেষক প্রকাশনা

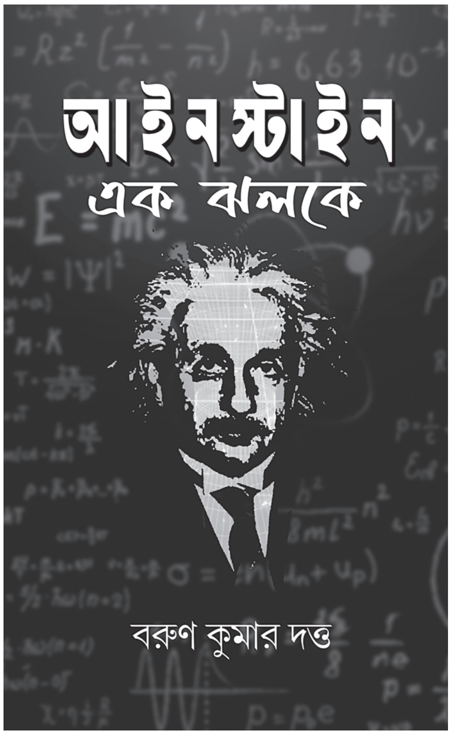

শুভদীপ মুখোপাধ্যায় এবং সৈকত কুমার বসু

জলবায়ুর পরিবর্তন ও সুন্দরবনের ফিশিং ক্যাট (*Prionailurus viverrinus* Bennett)

সারাংশ : মাছ ধরার বিড়াল (Prionailurus viverrinus Bennett) *আইইউসিএন রেড লিস্টে 'ভালনারেবল' হিসাবে তালিকাভুক্ত, আবাসস্থল ধ্বংস, শিকার এবং মানব-বন্যপ্রাণী সংঘর্ষের কারণে জনসংখ্যা ক্রমাগত হ্রাসের সম্মুখীন। সুন্দরবন, পশ্চিমবঙ্গ (ভারত) এবং বাংলাদেশে বিস্তৃত একটি অনন্য ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেম, এই প্রজাতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থলগুলির মধ্যে একটি। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে পশ্চিমবঙ্গে (ভারত) মানুষের বসতি, কৃষি, জলজ চাষ (চিংড়ি চাষ) এবং বন উজাড়ের কারণে আবাসস্থল বিভক্ত হওয়ার কারণে তাদের জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশে মাছ ধরার বিড়াল ক্রমবর্ধমান মানুষের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। মূলতঃ মানুষের বসতি, জলজ চাষ (বিশেষ করে চিংড়ি চাষ) দ্রুত সম্প্রসারণ এবং জলাভূমিকে কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তর করা আবাসস্থল ধ্বংসের প্রধান কারণ। সুন্দরবনে মাছ ধরার বিড়ালের বেঁচে থাকার আশা রয়েছে। এই অঞ্চলে এই প্রজাতির দীর্ঘমেয়াদী বেঁচে থাকার জন্য অবিরত গবেষণা, শক্তিশালী সংরক্ষণ পদক্ষেপ এবং ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপরন্তু, সংরক্ষণের প্রচেষ্টায় স্থানীয় সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করা মানব-বিড়াল দ্বন্দ্ব কমাতে এবং মাছ ধরার বিড়াল এবং মানুষ সহাবস্থান করতে পারে তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।*

ভূমিকা : সুন্দরবন (২১° ৩১ উত্তর-২২° ৩০ উত্তর, ৮৮° ০১ পূর্ব-৮৯০৫১ পূর্ব), বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে বিস্তৃত অনন্য বাস্তুতন্ত্রে সমৃদ্ধ একটি স্বীকৃত রামসার স্থান (১৯৯২) ও একটি ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান (১৯৯৭), যা সামগ্রিকভাবে বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ব-দ্বীপ অঞ্চল (চিত্র ১) (Chakraborty et al., 2009)। গঙ্গা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীত্রয়ের অববাহিকার বদ্বীপ এলাকায় অবস্থিত একমাত্র এই ম্যানগ্রোভ জঙ্গল যেখানে বাঘের আবাস যা কিনা ১০,২৬০ বর্গ কিলোমিটার [60% অর্থাৎ প্রায় ৬০০০ বর্গ কিমি (১৩৮৭ বর্গ কিমি সংরক্ষিত বন)] বাংলাদেশের খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলা এবং বাকিটা [80% অর্থাৎ প্রায় ৪২৬০ বর্গ কিমি (২৩০০ বর্গ কিমি সংরক্ষিত বন)] ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর চব্বিশ পরগনা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জুড়ে বিস্তৃত (Chakraty et al., 2020)। পতিতপাবনী গঙ্গা নদী ও 'বুঢ়ালুইত' ব্রহ্মপুত্র নদ, তাদের একাধিক প্রাচীন অববাহিকার অবশিষ্ট অংশ, ছোট-বড় শতাধিক শাখানদী এবং নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমির প্রধান আটটি নদী, হুগলী বাদেমুড়িগঙ্গা, শতমুখী, ঠাকুরান, মাতলা, ভাঙ্গাদুনি, গুয়াসোবা, হাড়িভাঙ্গা, রায়মঙ্গল এবং এই প্রবাহগুলির সংযোজক খাড়ী, খালি, দোয়ানিয়া, পয়ান প্রভৃতি একত্রিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে উপনীত হওয়ার আগে, বাংলার দক্ষিণাংশে সৃষ্টি করেছে, এই সুবৃহৎ বদ্বীপ

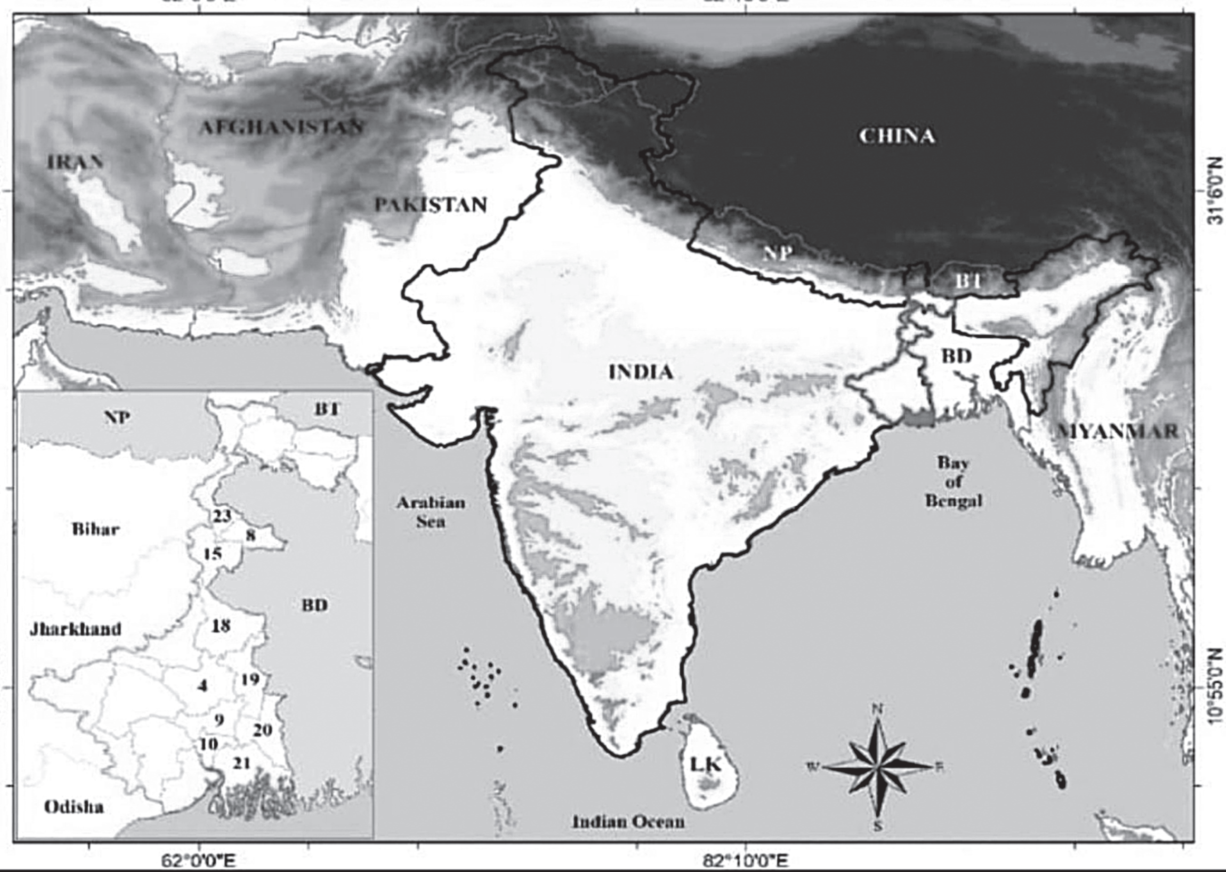

চিত্র ১: দক্ষিণ এশিয়ার মানচিত্রে ভারত ও বাংলাদেশ জুড়ে বিস্তৃত সুন্দরবন ব-দ্বীপকে দেখানো হয়েছে।

অঞ্চলের, যার প্রধান উপাদানই হল এই নদ-নদী দ্বারা বয়ে আসা বিপুল পরিমাণ উর্বর পলিমাটি (Bhakat et al., 2004)।

জীব বৈচিত্র্যে ভরা এই অদ্ভুত রহস্যময়ী বাদাবনে, দক্ষিণ রায়ের একচ্ছত্র রাজত্ব ছাড়াও বিভিন্ন পশুপাখি, সরীসৃপ, কীতপতঙ্গ ও বিভিন্ন মাইক্রো ফ্লোরা ও ফনার সম্মেলনে গড়ে উঠেছে এক অনবদ্য বাস্তুতন্ত্র, ইতিহাসে যা বিরল (Chakraborty et al., 2009)। বনবিবি-দক্ষিণরায়ের নানা কল্পকাহিনী ও লোকগাঁথা সম্বলিত এই 'আঠারো ভাটির দেশ' সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্যের অবিসংবাদিত শাসক যেমন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, তেমনি আরও একটি প্রজাতি এই অনন্য ম্যানগ্রোভ বনের নদীনালা, খাঁড়ি আর নোনা জলের জোয়ার ভাঁটায় নিত্য ঘরবসত করে। সম্পর্কে সে বাঘের মাসি, ফিশিং ক্যাট (Phosri et al., 2021)। অত্যন্ত বিরলদৃষ্ট লাজুক স্বভাবের এই প্রাণীটির সম্পর্কে আরো অনেক অনুসন্ধানের প্রয়োজন। সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত এই প্রতিবেদনে সুন্দরবনের ফিশিংক্যাট ও ম্যানগ্রোভ বাস্তুতন্ত্রের সম্পর্ক নিয়েই আলোকপাত করা হয়েছে।

সুন্দরবনের ফিশিং ক্যাট : মার্জার গোত্রের প্রাণীরা নাকি জলকে পরিহার করে চলে, এমন প্রবাদ ছোটবেলায় অনেক শুনেছি। কিন্তু প্রকৃতির এই সৃষ্টিশালায় এই মার্জার গোত্রের বিগ ক্যাট ফ্যামিলির একটি প্রাণী আছে, যার জীবনের অধিকাংশ সময়ে তাকে জলেই থাকতে হয় (Phosri et al., 2021)। জল ছেঁচে তুলে আনতে হয় তার প্রধান খাদ্য মাছ। পোশাকি নাম তার ফিশিং ক্যাট বা মেছো বিড়াল। স্থানভেদে ডাকনাম মেছোবাঘ, বাঘরোল বা মাছবাঘ, বৈজ্ঞানিক নাম Prionailurus viverrinus Bennett (চিত্র ২)। ভারত, বাংলাদেশ, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, শ্রীলঙ্কা সহ দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে দেখা যায় (Kolipaka, 2006)। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে এবং বাংলাদেশে এরা স্থানীয়ভাবে বাঘরোল নামে পরিচিত। এছাড়া আসামে মেচেকা, অন্ধ্রপ্রদেশে বাভুরু পিল্লি (অর্থাৎ বন্য বিড়াল), শ্রীলঙ্কায় হান্দুন দিভিয়া, থাইল্যান্ডে সুইয়া প্লা (অর্থাৎ Fish Tiger), মায়ানমারে কায়াউং টাংগা নামে পরিচিত। ইন্দোনেশিয়াতে এদের বলা হয় 'কুচিং বাক্যাও' (অর্থ-ম্যানগ্রোভের বিড়াল)। মাঝারি আকারের বিড়াল গোত্রীয় একধরনের স্তন্যপায়ী বন্যপ্রাণী। বাঘ রোল সাধারণত নদীর ধারে, জলাশয় সংলগ্ন খড়িবন, হোগলাবন এবং ম্যানগ্রোভ অরণ্যে বাস করে। এরা সাঁতারে পারদর্শী হওয়ায় এ ধরনের পরিবেশে সহজেই খাপ খাওয়াতে পারে। এদের গায়ে ছোপ ছোপ চিহ্ন থাকার জন্য চিতাবাঘ বলে ও ভুল করা হয়। বিভিন্ন কারণে এদের সংখ্যা বর্তমানে খুব কমে গেছে। তাই IUCN 2008 সালে বাঘরোলকে বিপন্ন (Endangered) প্রজাতির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। ২০১৬ সালে IUCN বাঘরোলকে সংকটাপন্ন (Vulnerable) প্রজাতির তকমা দেয়। পশ্চিমবঙ্গে 'রাজ্য প্রাণী' হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে বাঘরোল (Phosri et al., 2021)।

দৈহিক বৈশিষ্ট্য : সাধারণ বেড়ালের প্রায় দ্বিগুণ আকৃতির এই প্রাণীটি একটু গাঁট্টাগোট্টা প্রকৃতির। এদের পাগুলি ছোট হয়, মাথাটি বড় এবং ছোটো লেজ যা মূল দেহের প্রায় ১/৩ অংশ। লেজের শেষের দিকে কালো রিং দেখা যায়। স্থানভেদে ছাই রঙের বা বাদামি ধূসর মোটা লোম বিশিষ্ট যাতে নির্দিষ্ট কালো কালো গোল ও লম্বা দাগ থাকে। খরখরে লোমশ শরীর (Kolipaka, 2006)। মাথা থেকে কাঁধের দিকে ৬ থেকে ৮টি লাইন লম্বা টানা ডোরা, শরীরের পাশের দিকটায় আবার ছোপ ছোপ। ডোরা আছে মুখে, পেটের দিকটা সাদাটে। যত ঘাড় থেকে পিছনের দিকে যাওয়া যায় তত সেগুলি লম্বা থেকে গোলাকৃতি বিচ্ছিন্ন দাগ সৃষ্টি

চিত্র ২: সুন্দরবনের ফিশিং ক্যাট (Prionailurus viverrinus Bennett). চিত্র ঋণ: সৌম্যকান্তি নন্দী

করে। গোলাকৃতি ছোট কানের পিছনে সাদা দাগ দেখা যায়। এরা তীব্র যৌন দ্বিরূপতা দেখায় অর্থাৎ পুরুষটি আকারে বড় হয়। দেহ দ্বিপার্শীয় প্রতিসম। সাধারণতঃ ৬-১২ কেজি ওজন বিশিষ্ট দেখা যায়। মাথাসহ দেহ ২২-৩১ ইঞ্চি ও লেজের দৈর্ঘ্য ৮-১২ ইঞ্চি পর্যন্ত এরা হতে পারে (Chakraborty et al., 2009)।

বাসস্থান : মূলতঃ এরা খড়িবন, হোগলা বন ও জলাভূমির আশেপাশে থাকতে পছন্দ করে। সুন্দরবনের ফিশিং ক্যাট ম্যানগ্রোভ বাস্তুতন্ত্রের তৃতীয় ট্রফিক স্তরের খাদক। শ্বাসমূল, ঠেসমূল ঘেরা কাদামাটির বাদাবনে এদের দেখা যায় চুপ করে বসে থাকতে। জোয়ারের জল যতটুকু স্থানে পৌঁছায়, তার ঠিক উপরের স্তরেই এদের দেখা যায়, যদিও খুব কমই দেখা পাওয়া যায়।এরা মূলত নিশাচর প্রকৃতির প্রাণী (Chakborty et al., 2020)।

স্বভাব, আচরণ ও খাদ্যাভাস : এরা মূলত একা একা থাকতে পছন্দ করে।স্বভাবে লাজুক প্রকৃতির। প্রধানত মৎস্যভোজী হলেও খাদ্যের জোগানের অভাব ঘটলে এদের গ্রামের দিকে হাঁস, মুরগী খেতেও দেখা যায়। এছাড়া কাঁকড়া, অন্যান্য ক্ষুদ্রাকৃতির কবোচী শ্রেণির প্রাণী, ছোট স্তন্যপায়ী, পাখি, সরীসৃপ, উভচর প্রভৃতি সবই এদের খাদ্য তালিকায় আছে। সুন্দরবনে এদের একমনে জলের দিকে তাকিয়ে ধৈর্য সহকারে জল সংলগ্ন কোনো ম্যানগ্রোভের ডালে বসে থাকতে দেখা যায় (Kolipaka, 2006)। মাছের দেখা পাওয়া মাত্র এরা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তা কামড়ে তুলে নিয়ে আসে। সুন্দরবন বাস্তুতন্ত্রের এরা গুরুত্বপূর্ণ খাদক। সংলগ্ন গাছের ডালে নিজের মাথা, কপাল, গাল প্রভৃতি ঘষে, নিজদেহ নিঃসৃত মুত্র ত্যাগ করে এরা নিজ এলাকা চিহ্নিত করে থাকে। একে বলে 'সেন্ট মার্কিং' (Chakraborty et al., 2020)। এটি পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ একটি আচরণ (Swanson, 2006)। এদের জনন প্রক্রিয়া সম্পর্কে খুব কম তথ্য পাওয়া যায়। এদের প্রজননকাল জানুয়ারি থেকে এপ্রিল। সাধারণতঃ বছরে দুবার এদের বাচ্চা প্রসব হয়। গর্ভধারণ সময়কাল ৬৩ দিন। তবে প্রাকৃতিক পরিবেশে এই সম্পর্কে সেভাবে কোনো তথ্য পাওয়া যায়না (Swanson, 2006)। সুন্দরবনে শীতকালের দিকে ফিশিং ক্যাটের বাচ্চাগুলিকে ম্যানগ্রোভের ডালে রোদ পোহাতে দেখা যায়। পুরুষ বাঘরোল গড়ে ১৬-২২ বর্গকিমি এবং স্ত্রী বাঘরোল গড়ে ৪-৬ বর্গকিমি এলাকা জুড়ে ঘোরাঘুরি করে (Mishra et al., 2018)। এলাকাবাসীদের তথ্যের ভিত্তিতে জানা গিয়েছে খুব কম হলেও সারা বছরই এদের দেখা অল্পবিস্তর পাওয়া যায় (Chakraborty et al., 2009)। বুড়িডাবরি থেকে কাটয়াঝুরি যাবার পথে, পঞ্চমুখানির দিকে প্রভৃতি জায়গায় লক্ষ্য করা গিয়েছে।

সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বাস্তুতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভকে জালের মত জড়িয়ে রয়েছে খাঁড়ি, কাদা চর এবং ম্যানগ্রোভ বনভূমির লবণাক্ততাসহ ক্ষুদ্রায়তন ১০২টি দ্বীপমালা। যার মধ্যে ৫৪টিতে মনুষ্য আবাস, বাকি ৪৮ টিতে মোট বনভূমির ৩১.১ শতাংশ, অর্থাৎ ১,৮৭৪ বর্গকিলোমিটার জুড়ে রয়েছে নদীনালা, খাঁড়ি, বিল মিলিয়ে জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল (Kolipaka– 2006)। এই ওয়ার্ল হেরিটেজ সাইট বনভূমিটি, ৩৪ প্রজাতির প্রকৃত ম্যানগ্রোভ, সংযুক্ত গাছ ৪০ প্রকার, ১৫০ শৈবাল, ১৬৩ প্রকার ছত্রাক, ৩২ প্রকার লাইকেন, ২৫০ প্রকার মৎস্য, ৭ প্রকার উভচর, ৫৯ প্রকার সরীসৃপ, প্রায় ২০০ প্রজাতির পাখি, ৩৯ প্রকার স্তন্যপায়ী এছাড়াও অসংখ্য প্ল্যাংক্টন, বেন্থস, পলিমাটির আর্থোপেডস ও ম্যানগ্রোভ নির্ভরশীল পতঙ্গ প্রভৃতি দেখা যায় (Banerjee and Santra, 1999)।

ফিশিং ক্যাটের ম্যানগ্রোভ অভিযোজন : জলীয় পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর জন্য এদের লোমগুলি মোটা আর স্তরে স্তরে বিন্যস্ত থাকে। দেহচামড়ার ঠিক ওপরেই ক্ষুদ্র লোমের ঘন আস্তরণ এদের শরীরে জল স্পর্শে বাধা দেয়। এমনকি এই স্তরের সাহায্যে ঠান্ডা জলে মাছের খোঁজে সাঁতার দেবার সময়েও তাদের দেহের তাপমাত্রা বজায় থাকে। জলীয় জীবনে সাঁতারের প্রয়োজনে এদের পায়ের আঙ্গুলগুলি লিপ্তপদ প্রকৃতির হয়, যদিও সেগুলি পায়ের উপরদিকের পাতায় বেশি বোঝা যায়। এরা দক্ষ শিকারি ও সাঁতারু হয়। রাত্রের অন্ধকারেও জলের মধ্যে এরা মাছের গতিবিধি খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে (Phosri et al., 2021)।

পরিবর্তনশীল জলবায়ু, ঘূর্ণিঝড় এবং সুন্দরবনের ফিশিংক্যাটের উপর তার প্রভাব : ঘূর্ণিঝড়ের নাম দেওয়ার রীতি চালু করে ওয়ার্ল্ড মেটেরোলজিক্যাল অর্গানাইজেশন ও ইউনাইটেড নেশনস ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কমিশন ফর এশিয়ার সদস্য দেশগুলো। ওয়ার্ল্ড মেটেরোলজিক্যাল অর্গানাইজেশন (WMO) অধীন জাতিসংঘের এশিয়া-প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলের সমুদ্র তীরবর্তী ১৩টি দেশের আবহাওয়াবিদদের সংস্থা এস্কেপ ঘূর্ণিঝড়ের নাম দিয়ে থাকে। ঘূর্ণিঝড়কে চিহ্নিত করার জন্যই নামকরণ প্রথা চালু করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের নাম গ্রহণ করা মানুষের পক্ষে মনে রাখা সহজ করে তোলে। এই নামের সাহায্যে গণমাধ্যম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ, গবেষক বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষরা যেন সহজেই একে চিনতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই এই নামকরণ। নামের মাধ্যমেই বুঝিয়ে দেওয়া হয় এটি আলাদা ঘূর্ণিঝড়। এই ব্যাপারে সচেতনতা বাড়াতে, প্রস্তুতি নিতে, বিভ্রান্তি দূর করতে নাম কাজে লাগে। ঘূর্ণিঝড় আসলে কোনো অঞ্চলের সাইক্লোনিক সিস্টেম (Cyclonic System)। বিশ্বের সব দেশেই গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড়ের একইভাবে নামকরণের রীতি চালু আছে। সুন্দরবনের ভৌগোলিক অবস্থান এমনই যে Bay of Bengal সৃষ্ট যে কোনো ধরণের ঘূর্ণিঝড়-এর দিকে ধেয়ে আসার একটা প্রবণতা দেখা যায়। সালের হিসেবে দেখা যায় ১৯৮৯, ১৯৯১ সালের সুন্দরবন সাইক্লোন এর পর বড় সাইক্লোন আবার আসে ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯ পর পর যথাক্রমে সিডার, নার্গিস, আয়লা। এরপর ক্রমেই একটা ধারাবাহিকতা দেখা যায়, ফণি, বুলবুল, আম্ফান (২০২০), ইয়াশ (২০২১) এবং সবশেষে রেমিল (২০২৪)।

বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে হারিয়ে গিয়েছে অন্তত চারটি দ্বীপ। এক সময়ের ঘোড়ামারা দ্বীপ ছিল সাগর দ্বীপের মধ্যে। ১৮৮৭ সালের মানচিত্র থেকে দেখা যায় ক্রমশ তা সাগরদ্বীপ থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। ১৯২৩ সালে তা সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ১৯৬৪-৬৯ সাল নাগাদ দেখা যায় ঘোড়ামারা আর সাগরদ্বীপের ক্রমশ ব্যবধান বৃদ্ধিপাচ্ছে। অনুমান করা হচ্ছিল প্রবল জলোচ্ছ্বাসের প্রভাবে ঘোড়ামারা অদূর ভবিষ্যতে জলে তলীয়ে যেতে পারে। এবারে ইয়াশের জলোচ্ছ্বাস সেই কথাই প্রমাণ করে দিল। ম্যানগ্রোভ ও সুন্দরবনের ভবিষ্যৎ সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ ধ্বংশের পিছনে যেমন জলের লবনাক্ততা বৃদ্ধি একটা প্রাকৃতিক কারণ তেমনি ভেরী তৈরি করে মাছ চাষ এক সর্বনাশা কারণ। এর ফলে যেমন বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তেমনই ম্যানগ্রোভ এর চারা প্রচুর নষ্ট হয় (Rana et al., 2022)। বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ম্যানগ্রোভ রোপণ হচ্ছে, একদিকে তা ভালো তবে শুধু রোপণ করলেই হবে না, তার কোনো রক্ষণাবেক্ষণ না হলে শুধু শুধু টাকা ও শ্রমের নষ্ট ছাড়া

তা আর কিছুই নয়। প্রসঙ্গত বলি উপযুক্ত পরিবেশ ও মানুষের আনাগোনা নেই এরকম স্থানে ম্যানগ্রোভ যদি রোপণ করা যায় ও তা একদুদিন যদি স্থায়ী হয় তাহলেই তার বৃদ্ধি হতে দেখা যায় (Chakraborty and Chaudhury, 1985; Chakraborty et al, 2009, 2020)।

এ প্রসঙ্গে ফিডলার ক্রাবের ভূমিকা দারুণ। কাঁকড়ার গর্তের মধ্যে ম্যানগ্রোভের বীজ জরায়ুজ অংকুরোদগমের পরে জোয়ারের জলে ভাসতে ভাসতে এসে আটকে যায় ও সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ভাবে ম্যানগ্রোভ গড়ে উঠে। বিভিন্ন স্যালিনিটিতে ম্যানগ্রোভ গ্রোথ বিভিন্ন হয়। তবে সুন্দরবন থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে সুন্দরী গাছসহ আরো অনেক ম্যানগ্রোভ। 'টপ ডাইং' রোগ সুন্দরী গাছের মরে যাবার জন্য প্রাকৃতিক একটি কারণ। মাটির মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টসের জোগান লবণাক্ততা বৃদ্ধির সাথে সাথে কমে যেতে থাকে। কারণ ভেরী তৈরির জন্য মিষ্টি জলের জোগান সুন্দরবনের নদীগুলিতে কমে গেছে। উপরন্তু অধিক লাভের জন্য জলে বিষ দিয়ে মাছ ধরা ম্যানগ্রোভ ধ্বংশের এক অন্যতম কারণ। প্রকৃতির অফুরন্ত জীববৈচিত্র্যের সম্ভার নিয়ে এই 'আঠেরো ভাঁটির দেশ' ক্রমশই জলোচ্ছ্বাসের মুখে হারিয়ে যেতে বসেছে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন জৈব উপাদান গুলির মধ্যে তিনটি সবুজ উদ্ভিদ প্রজাতি (ম্যানগ্রোভ, বেনথিক শৈবাল, ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন) দ্বারা প্রথম ট্রফিক স্তর রচিত হয়। বাদাবনের বাস্তুতন্ত্রে এরাই হল উৎপাদক (Chakraborty and Chaudhury, 1985)। দ্বিতীয় ট্রফিক স্তরের কাঁকড়া, মোলাস্কা, চিতল হরিণ, বন্য শূকর, পাখি ও হনুমান প্রভৃতি প্রাণীরা এই উৎপাদক গুলিকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। তৃতীয় ট্রফিক স্তরের প্রাণীরা মাংসাশী ও সর্বভূক প্রকৃতির হয়। ফিশিং ক্যাট এই গোত্রেই পরে। এছাড়াও গাঙ্গেয় ডলফিন, কামঠ, লেপার্ড ক্যাট, অট্যার প্রভৃতি থাকে। সর্বোচ্চ স্তরে রাজ করে এই রহস্যময় বাদাবনের দুই এলাকার দুই অবিসংবাদী শাসক, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আর নোনাজলের কুমীর।

ফিশিং ক্যাট ম্যানগ্রোভের 'ফ্ল্যাগশিপ স্পিসিস'। এরা না থাকলে বাস্তুতন্ত্রের শক্তিপ্রবাহ ছিন্ন হয়ে যাবে। ঠিক একইভাবে বাস্তুতন্ত্রে কোন একটি প্রজাতির অভাব এদের খাদ্যশৃঙ্খলে বিঘ্ন ঘটায় (Chakraborty et al., 2009)।

প্রাক্-বর্ষাকাল, বর্ষাকাল, শরৎকাল ও শীতকালের জলবায়ু অনুযায়ী এখানের বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন ফ্লোরা ও ফনার ওঠাপড়া দেখা যায়। জলবায়ু পরিবর্তন, বিশেষ করে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে বাষ্প বেশি তৈরি হয়, ফলে জলে বাড়ছে লবনাক্ততার পরিমাণ। পাশাপাশি নদীগুলির ওপরের অঞ্চল থেকে ক্রমেই মিষ্টি জল আসার পরিমাণ কমে যাওয়ার কারণেও সুন্দরবন অঞ্চলে লবণাক্ততা বাড়ছে (Banerjee and Santra, 1999)। যেহেতু মাছ জলের পরিবেশগত বিষয়ে অত্যন্ত সংবেদনশীল; তাই ক্রমেই সুন্দরবনে মাছের পরিমাণ কমছে। কোপেপড (ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কবোচী শ্রেণির সামুদ্রিক প্রাণী)-দের সংখ্যা বর্ষা ও শীতের শেষে বেশি দেখা যায়। তেমনি প্রাক্-বর্ষায় যখন লবনাক্ততা বেশি তখন ক্ল্যাডোসেরা গোত্রের জলজ প্রাণীদের আধিক্য বৃদ্ধি পায়। 'ফিডল্যার ক্র্যাব'দের সংখ্যা প্রাক্-বর্ষায় বেশি হয়, তেমনি বিভিন্ন পলিকিটদের সংখ্যাধিক্য বর্ষায় বেশি দেখা যায় (Bhakt et al., 2004)। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে বেনথিক ফণা গ্রুপগুলি প্রাকবর্ষায় সংখ্যাধিক্য দেখা যায় কিন্তু ভরাবর্ষায় এরা সংখ্যায় সর্বনিম্ন থাকে। সেইজন্যই ভরাবর্ষায় পলিকিট ও মোলাস্কা শ্রেণির প্রাণীদের সংখ্যাধিক্য হয়। সেই কারণেই প্রাক্-বর্ষায় ফিশিং ক্যাটেদের কাঁকড়া খেতেও দেখা যায় (Rana et al., 2022)।

ভরাবর্ষায় ম্যানগ্রোভ অরণ্যের খাড়ি গুলিতে ঝাঁকে ঝাঁকে সমুদ্রের মাছ ঢুকে পড়ে। মিষ্টি জল ও নোনতা জলের সংমিশ্রণে এসে মাছেরা এখানে ডিম পাড়ে। তাই সেই সময় এদের খাদ্যের জোগান অটুট থাকে। সেইজন্য ম্যানগ্রোভের ফিশিং ক্যাটেদের খাদ্যাভাস ঋতু অনুযায়ী খাদ্যের জোগানের উপর নির্ভর করে। মৎস্যভোজী এই লাজুক নিশাচরের খাদ্য শুধু এখানে মাছের উপরেই নির্ভর করে না, বাস্তুতন্ত্রে খাদ্যের অভাব ঘটলে এরা নিকটবর্তী লোকালয় থেকে হাঁস, মুরগী ইত্যাদিও শিকার করে (Chakraborty et al., 2022)। তাই ফিশিং ক্যাটেদের সংখ্যা ম্যানগ্রোভে কমে গেলে দ্বিতীয় ট্রফিক স্তরের প্রাণীগুলির সংখ্যাধিক্য ঘটবে; ফলে তাদের নিজেদের খাদ্যের জন্য আন্তঃপ্রজাতির সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে। সেক্ষেত্রে বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে। জলবায়ু পরিবর্তনে সমুদ্রের জলস্তর ক্রমশ বাড়ছে। সমুদ্র যেমন এগোচ্ছে তেমনি উপকূলের মাটি বসে যাচ্ছে। বিধিনিষেধ ও সতর্কতার পরেও সুন্দরবনের কোর এলাকা থেকে গত দুই দশকে ১১০ বর্গকিলোমিটার বনাঞ্চল লুপ্ত হয়েছে। একটি গবেষণায় উঠে এসেছে যে সুন্দরবনে প্রতি বছর ১.৩৮ শতাংশ হারে জঙ্গল মুছে যাচ্ছে শেষ কুড়ি বছরে (Chakraborty et al., 2020, 2022)। সমুদ্রতলের ক্রমশ উঠে আশা বা ভূমির নেমে যাওয়ার বা সাইক্লোনের আছড়ে পড়া, এই তিন পরিবর্তনে যেটা হচ্ছে সেটা হল ফলে ফিশিংক্যাটদের বাসস্থান সঙ্কট দেখা দিচ্ছে। নোনা জলে পুকুর, জমি এবং ভৌম জলস্তরে ঢুকে যাওয়ার ফলে তাদের পানীয় জলের সংকট দেখা যাচ্ছে (Rana et al., 2022)।

তথ্যসূত্র

1. Banerjee, A. and Santra, S. C. (1999) Plankton composition and population density of the Sunderbans Mangrove estuary of West Bengal (India). In : D. N. Guha Bakshi, P. Sanyal and K.R. Naskar (cds). Sunderbans Mangal. Naya Prokash Publication, Calcutta : 340-349.
2. Bhakat, R.K. Chakravarty, G., Giri, S. and Chakraborty, S. K. (2004). Invasive species in Sunderbans Mangrove Ecosystem, India. In : Fish Diversity in Protected Habitats, Edts. S. Ayyappan, D.S. Malik, R. Dhanze and R.S. Chauhan, (Pub. by Natcon publication) : 219-240.
3. Chakraborty S.K. and Chaudhury, A. (1985) Distribution of fiddler crabs in Sundarban's Mangrove estuarine complex, India. The Mangroves : Proceedings of National Symposium Biology Utilization Conservation of Mangroves : 467-472.
4. Chakraborty, S.K., Giri, S. Chakravarty, G. and Bhattacharya, N. (2009) Impact of eco-restoration on the biodiversity of Sundarbans Mangrove Ecosystem, India. Water Air Soil Pollution : Focus 9 : 303-320.
5. Chakraborty, S., Barik, S., Saha, R., Dey, A., Deuti, K. Venkatraman, C. And Saha, G. K. (2020). Camera-trap records of fishing cat (Prionailurus viverrinus) from East Medinipur (West Bengal, India) and notes on threats to this population. Ecoscience; 27 (3), 149-156. https://doi.org/10.1080/11956860.2020.1752500

প্রথম লেখক রিসার্চ স্কলার, শিক্ষা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা
দ্বিতীয় লেখক কানাডার কৃষিবিদ ও পরিবেশবিদ

e-mail: saikat.basu@gmail.com • M. 8697491914

ড. বরুণ কুমার দত্ত

সাধারণ অপেক্ষবাদের বিশেষ তাৎপর্য্য

সংক্ষেপ : আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব শুধুমাত্র নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বকে সমৃদ্ধশালী করেনি, এটিকে আরও ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রসারিত করেছিল, যার বৈজ্ঞানিক অভিঘাত সুবিশাল। বর্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপে ও সহজভাবে সেটার কয়েকটি বিশেষ দিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

নিউটনের সাবেকি বলবিদ্যা এবং ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎচুম্বকীয় তত্ত্বের মেলবন্ধনে আইনস্টাইন সৃষ্টি করেছিলেন বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব। এখানে গতির একটি বিশেষ অবস্থা (ত্বরণ ছাড়া) বিবেচিত হয়েছিল বলে এটিকে বিশেষ তকমা দেওয়া হয়েছিল। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বের কিছু অসংগতি রয়েছে, যেগুলি দূর করে বিশেষ অপেক্ষবাদের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে তৈরি হবে সাধারণ অপেক্ষবাদ, যা সর্বক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে। সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব হল নতুন একটি মহাকর্ষ ক্ষেত্র তত্ত্ব (Field theory of gravitation)। এই বিষয়ে আলোচনার জন্য কিছু প্রাথমিক ব্যাপারের দিকে নজর দেওয়া যাক। আপেক্ষিকতা তত্ত্বের রঙ্গম হল, স্থান-কালের একটি চতুর্মাত্রিক ব্যাপ্তি (Four dimensional space-time continuum)। বিশেষ আপেক্ষিকতায় এটিকে সমতল (Flat) ধরা হয়েছে, ব্যবহৃত হয়েছে মিনকাউস্কির গণিত ও জ্যামিতি। বলাবাহুল্য, সাধারণভাবে এই চতুর্মাত্রিক স্থান-কালের ধারণা করা কঠিন। এখানে প্রতিটি বিন্দুই একটি ঘটনার (Event) সঙ্গে সম্পর্কিত এবং শুধুমাত্র গণিতের সাহায্যেই তার বর্ণনা দেওয়া যায়। এই কাল্পনিক চতুর্মাত্রিক জগতের জ্যামিতিও আমাদের প্রতিদিনের সাধারণ ত্রিমাত্রিক জ্যামিতির চেয়ে এতটাই আলাদা যে সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর উপবৃত্তাকার কক্ষপথটি সরলরেখা হয়ে যায়।

সাধারণ অপেক্ষবাদের মূল বিষয় হল প্রথমত বস্তুর জাড্যজনিত ভর এবং মহাকর্ষীয় ভরের তুল্যতা (Equivalence), দ্বিতীয়ত, চতুর্মাত্রিক দেশকালের বক্রতা বিষয়ক জ্যামিতি আর তৃতীয়ত, বস্তু ও মহাকর্ষ ক্ষেত্র সম্মিলিত ভাবে অবশ্যই শক্তির সংরক্ষণ সূত্র মেনে চলবে। নিউটনের মতে মহাকর্ষ হল এক ধরনের বল এবং এটি তাৎক্ষণিক ভাবে ক্রিয়াশীল (Instantaneous interaction)। কিন্তু আইনস্টাইন প্রমাণ করলেন মহাকর্ষ কোন বল নয়, এটি হল একটা ক্ষেত্র (Field) এবং এটি তাৎক্ষণিক ভাবে ক্রিয়াশীল নয় বরং আলোর গতিবেগেই চলে। এখানে বস্তু (বা শক্তি)-র উপস্থিতি স্থান-কালের বুনোটকে (Space-time fabric) বাঁকিয়ে বা দুমড়ে মুচড়ে (Wraped) দেয় এবং ঐ দোমড়াননো স্থান-কাল বস্তুকে বলে দেয় কিভাবে গতিশীল হতে হবে। অর্থাৎ মহাকর্ষ হল, বস্তুর (বা শক্তি) উপস্থিতিতে চতুর্মাত্রিক স্থান-কালের জ্যামিতিক বর্ণনা মাত্র। অন্যভাবে বলা যায়, মহাকর্ষ হল স্থান-কাল ও বস্তু-শক্তির আন্তক্রিয়ার (Instantaneous) সৃষ্ট একটি গুণ বা ধর্ম। সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য হল, ক্ষেত্র পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মের মধ্যে থেকেই নিউটনের দূর ক্রিয়ার (Far action) ধারণাকে পরিত্যাগ করা। এখানে বস্তু পরিচালিত হয়, বক্র দেশ-কালের সংস্পর্শের জন্যই, দূরবর্তী বস্তুর আকর্ষণের দ্বারা নয়। বলাবাহুল্য ভরের উপস্থিতি দেশ-কালকে বক্র করে দেয় কারণ ঐ ভরের মধ্যে শক্তি রয়েছে। গাণিতিক বিশ্লেষণে তিনি আরও প্রমাণ করলেন, বঙ্কিম স্থান-কালে ভ্রাম্যমাণ গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র এবং আলোকরশ্মি একাধিক সম্ভাব্য যাত্রাপথের মধ্যে হ্রস্বতম (Shortest) পথটি সব সময় বেছে নেয়— সে পথের নাম জিওডেসিক (Geodesic) বিভিন্ন ভরের বস্তুর উপস্থিতিতে মহাকর্ষ ক্ষেত্রের বক্রতা কত হবে সেটাও অঙ্ক কষে তিনি বের করলেন।

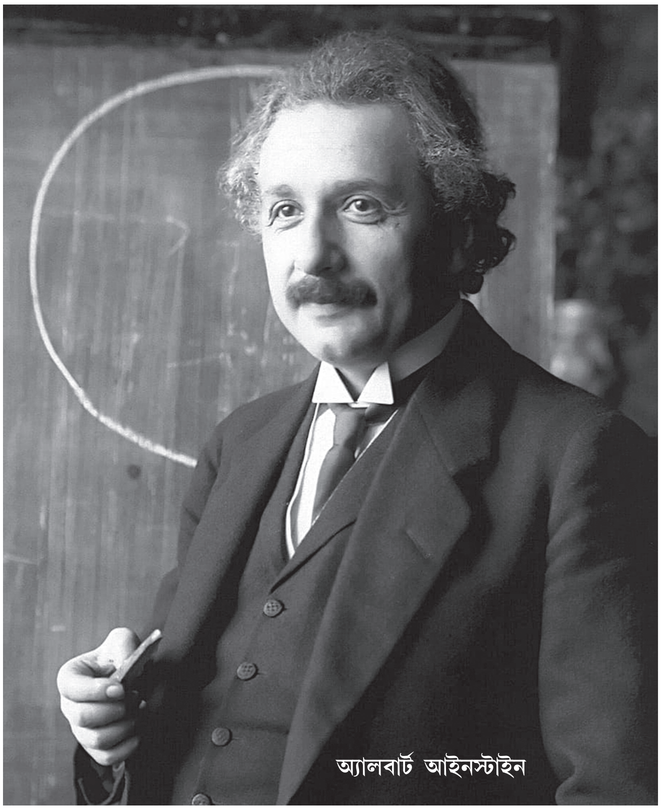

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

এইরকম বক্রতলের সব হিসেব করতে হবে রিম্যানের জ্যামিতির সাহায্যে, যেখানে দুটি খুব কাছাকাছি বিন্দুর দূরত্ব (ds) বা মেট্রিক দ্বারা সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হয়। আনুষঙ্গিক গণিতটি কোন সাধারণ ক্যালকুলাস নয়, জটিল টেনসর ক্যালকুলাস (Tensor Calculus)। মোটামুটি এই হল সংক্ষেপে সাধারণ অপেক্ষবাদের তাত্ত্বিক খুঁটিনাটি। অতিকায় ভর বিশিষ্ট (Massive object) কোন বস্তুর ভর M হলে ঐ বস্তু থেকে Z দূরত্বে কোন বিন্দুতে বস্তুটির মহাকর্ষ ক্ষেত্রের শক্তি (Strength) বা প্রাবল্যের নির্দেশক (α) হলে, α-র ফর্মুলা হল $\alpha \frac{2GM}{C^2 r}$, যেখানে G = নিউটনের মহাকর্ষ ধ্রুবক এবং C = শূন্য মাধ্যমে আলোর গতিবেগ।

যদি α-র মান 1 এর থেকে খুবই ছোট হয় অর্থাৎ $\alpha << 1$ হলে ঐ মহাকর্ষ ক্ষেত্রটিকে দুর্বল (Weak gravity) বলা হয়, সেখানে নিউটনের সূত্রে সব কিছুর ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে। কিন্তু যদি $\alpha \geq 0.1$ হয়, তখন সেটি শক্তিশালী মহাকর্ষ ক্ষেত্র (Strong gravity) হিসাবে গণ্য হবে। উদাহরণ হল, মহাকাশে রয়েছে নিউট্রন নক্ষত্র যার ভর খুবই বেশি (অতি প্রবল মহাকর্ষ ক্ষেত্র) সেখানে $\alpha > 0.1$ এবং কৃষ্ণ গহ্বরের (Black

hole) ক্ষেত্রে $\alpha = 1$ অর্থাৎ সবচাইতে বেশি। এভাবেই আইনস্টাইন নিউটনীয় মহাকর্ষের সীমা নির্ধারণ করেছিলেন।

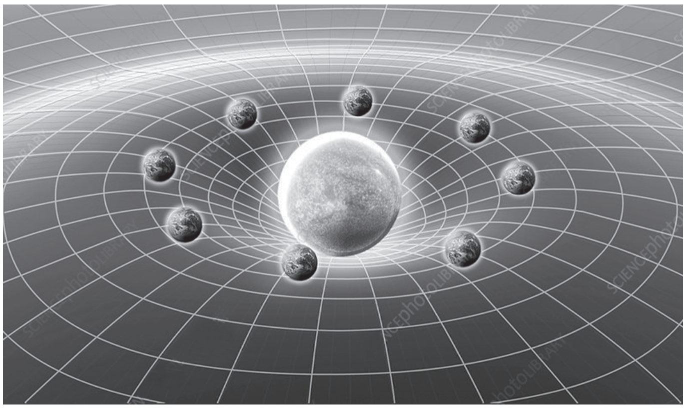

যাইহোক, গণিত পদার্থবিজ্ঞান ও দর্শনের এক অপূর্ব মেলবন্ধনে আইনস্টাইন সৃষ্টি করেছিলেন পদার্থবিজ্ঞানের সর্বকালের সেরা সুন্দরতম আবিষ্কার সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব। এই ব্যাপারে আইনস্টাইন কতকগুলি ক্ষেত্র সমীকরণ (Field Equations) দিয়েছিলেন, যা আইনস্টাইনের সমীকরণ নামে পরিচিত। সাধারণ পাঠকদের সুবিধার জন্য এখানে শুধুমাত্র তার সরলতম রূপটি দেওয়া হল।

$$R_{ij} = KT_{ij} \quad (i,j = 0,\ 1,\ 2,\ 3)$$

যেখানে R_{ij} = স্থান-কালের বক্রতা নির্ণয়ক টেনসর (Curvature tensor), $K = (8\Pi G/C^4)$ = আইনস্টাইনের মহাকর্ষ ধ্রুবক, যার মান হল $= 2.073\times10^{-48}\ Sec^2Cm^{-1}gm^{-1}$, এবং T_{ij} = শক্তি-ভরবেগ বন্টন নির্ণায়ক টেনসর (Energy-momentum tensor).

$$(\text{Space-Time}) \longleftrightarrow (\text{Matter-Energy})$$

ক্ষেত্র সমীকরণগুলিতে G এর উপস্থিতি এটাই প্রমাণ করে যে নিউটনীয় গ্র্যাভিটি আজও সমান প্রাসঙ্গিক— বাতিল হয়ে যায়নি। আবার সীমার ধারণায় $C \to \infty$ হলে $R_{ij} = 0$, অর্থাৎ স্থান-কালের বক্রতা নেই, বা এটি সমতল (Flat)। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তত্ত্বে স্থান-কালের জ্যামিতির বিষয়টি একটি গাণিতিক উপায় মাত্র, ভৌত ধারণা নয়। মহাকর্ষ বলের অবশ্যই একটি প্রাকৃতিক চরিত্র রয়েছে যা সর্বদাই ক্রিয়াশীল। ক্ষেত্র সমীকরণের মধ্যে G-এর উপস্থিতি এমনটাই প্রমাণ করে। মহাকর্ষ ও ত্বরণ আসলে একই জিনিস— উভয়ে বেগ ভরের সঙ্গে সম্পর্কিত। এটাই সাধারণ অপেক্ষবাদের মূল ভিত্তি। ক্ষেত্র সমীকরণের ডানদিকের টেনসরটি হল, চতুর্মাত্রিক স্থান-কালের ব্যাপ্তির মধ্যে একটি ছোট জায়গায় কতটা পরিমাণ বস্তু (বা শক্তি) রয়েছে তারই পরিমাপক। আধুনিক যুগের তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী Lee Smolin-র ভাষায় বলা যায়, The main lesson of general relativity is that the geometry of space is not fixed. It evolves dynamically, changing in time as matter moves about it. আরেক প্রখ্যাত বিজ্ঞানী Michio Kaku খুব সুন্দরভাবে এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, Space-time is wraped by heavy masses, causing the illusion of gravitational force. This means that general relativity describes gravity, which affects all things in space-time. But in our universe, from racing car to rockets, we see that they are all accelerations that are continually changing at every point in space-time.

আরেকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, যাকে আমরা মহাকর্ষ বলে জানি, সেটি আসলে আমাদের ত্রিমাত্রিক জগতে তার একটা অভিক্ষেপ (Projection) মাত্র। এর আসল অস্তিত্ব রয়েছে চতুর্মাত্রিক স্থান-কালের জগতে— যেটি কষ্টকল্পিত অর্থাৎ শুধুমাত্র গাণিতিক ভাবেই প্রকাশ করা যায়। সেইজন্য এই সংক্রান্ত বক্ততাকে অন্তর্নিহিত বক্রতা (Intrinsic Curvature) বলা হয়।

প্রথমেই বলা হয়েছে, সর্বকালের সেরা এই তত্ত্বের সুদূরপ্রসারী অভিঘাতের কথা যা বিজ্ঞানের অনেক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে যেগুলিএখানে আলোচ্য নয়। তবে সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা যায়, সাধারণ অপেক্ষবাদ ছাড়া আমাদের GPS প্রতিদিন প্রায় 12 Km হিসাবে ভুল থাকত, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ঠিকঠাক কাজ করত না এবং কণা পদার্থবিজ্ঞানে ব্যবহৃত Particle accelerator যন্ত্রও ভুল ফলাফল দিত।

"Time, space and gravitation have no separate existence from matter."

Albert Einstein

তথ্যসূত্র

1. Science Reporter, December 2015.
2. জ্ঞান ও বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান বিশেষ সংখ্যা, জুন 2016.
3. An introduction to Relativity– J. V. Narlikar, Camb. Univ. Press 2010.
4. Essential Relativity– W. Rindler, Springer-Verlag 1977.

লেখক অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

e-mail: drbkodm@gmail.com • M. 9433775743

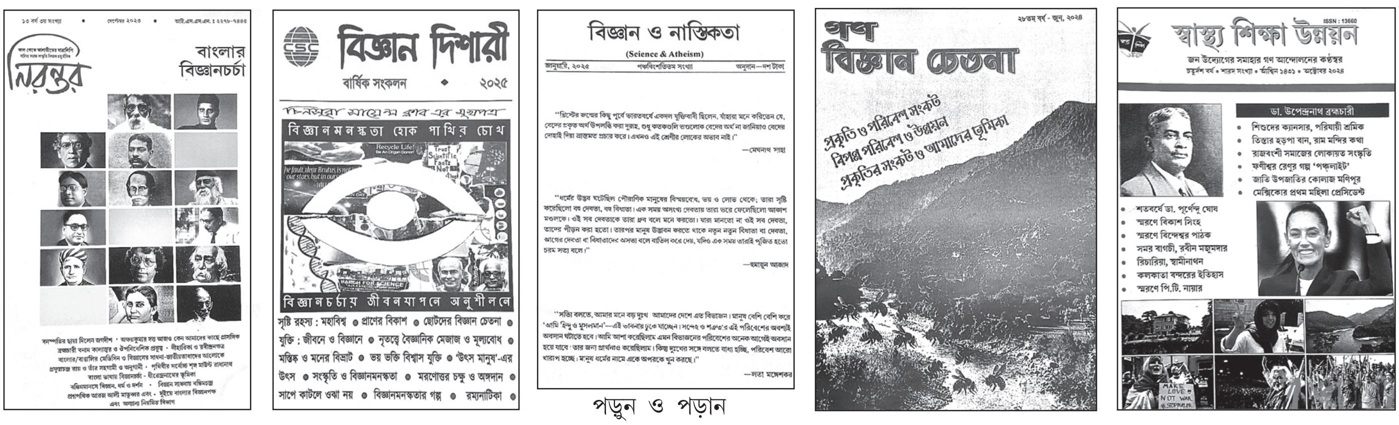

পড়ুন ও পড়ান

ড. অসিত ঘোষ

মৌল' র নামকরণের উৎস

সারসংক্ষেপ : মৌলের পর্যায় সারনিতে মৌলের অবস্থান পারমাণবিক সংখ্যা উপর ভিত্তি করে স্থানাঙ্ককরণের নিয়মাবলী অনেক আগেই জানা গিয়েছিল। মৌলের পরিচয়পঞ্জীর উৎস সন্ধানে IUPAC সিস্টেমে নামকরণে, আবিষ্কারকের নাম, আবিষ্কারকের দেশের নাম, ভাষা, আবার বিশেষ বিজ্ঞানীদের সম্মানার্থে, পৌরাণিক কাহিনি অনুকরণে, কখনো সৌরজগতের গ্রহের নামানুসারে চিহ্নিতকরণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করাই এখনকার সুলুক সন্ধান। পরম্পরা বজায় রাখতে গিয়ে ধর্মীয় সংস্কারে জড়িয়ে পড়া থেকে বিরত থাকার আবশ্যিকতার উপর জোর দেওয়া অভ্যাস গড়া দরকার।

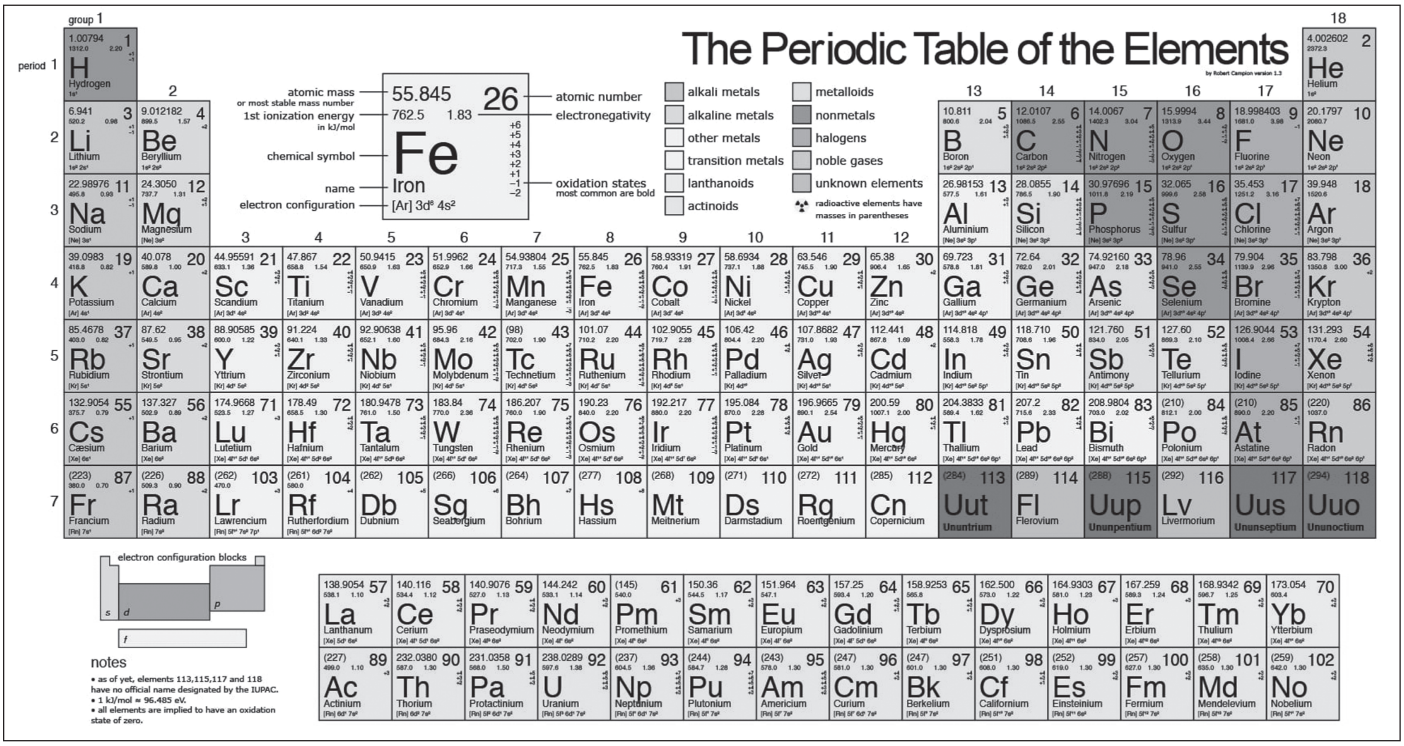

আমাদের এই গ্রহে, এখনও পর্যন্ত আবিষ্কার হয়েছে ১১৮টি মৌল। বহু বছর ধরে পৃথিবীর নানা মহাদেশের বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের দীর্ঘদিনের নিরলস গবেষণা, ধৈর্য আর পরিশ্রমের ফসল এমনই, মৌলসমূহের আবিষ্কার। আলোচনায়, তারই অংশবিশেষ এখানে উল্লেখ করছি। এই ভুবনডাঙ্গায় ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম 'ফসফরাস' (রাসায়নিক সংকেত P) মৌলটি আবিষ্কার হয়েছিল এবং ১১৮ তম মৌলটি, 'ওগানেসন' (সংকেত- Og), ২০০২ খ্রিস্টাব্দে আধুনিক পর্যায় সারণি-তে স্থান পায়। প্রত্যেক নতুন মৌল আবিষ্কার হয়ে, সরাসরি পর্যায় সারণীতে স্থান মোটেই জোটেনি। আবিষ্কারের পর সেটির প্রকৃতি, গুণাবলী, ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলীর পরিচয় ইত্যাদি বিষয়ে যুগপদ পরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণের ভিতর দিয়ে আন্তর্জাতিক সংসার দ্বারা স্বীকৃতি পেয়েছে, সর্বাগ্রে। স্বাভাবিকভাবেই এরপর এসেছে নামকরণ ও পর্যায় সারণীতে অন্তর্ভুক্তিকরণ পর্ব। অবশ্যই এই নামকরণ পিতামাতার আদরের সন্তানের নামকরণের মত নয় যে মনের আবেগ, স্নেহের পরশ আর কল্পনার মিশ্রণে জারিত এক সুন্দর শব্দবন্ধে সৃষ্টি, যা কোন নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ নয় বরং নিজস্ব। এক্ষেত্রে নতুন আবিষ্কৃত মৌলটির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলী নিশ্চয়ই বিস্ময়ের তবে তাদের যথেষ্টবৈচিত্র আছে এবং 'IUPAC system of Nomenclature' অনুযায়ী জৈব ও অজৈব যৌগদের নামকরণের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী মহলের মিলিত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হলেই প্রকাশ করা যায়।

সাধারণতঃ মৌলগুলির আবিষ্কারকের নামে অথবা আবিষ্কারের দেশের নামে মৌলের নামকরণ করা হয়ে থাকে। উদাহরণ নিশ্চয়ই দেওয়া যেতে পারে।

পোলোনিয়াম (Po) : আবিষ্কারক ম্যাডাম কুরীর জন্মভূমি পোল্যান্ডের নামানুসারে;

বার্কেলিয়াম (Bk) : আমেরিকার বার্কলে শহরের নামানুসারে;

স্ক্যানডিয়াম (Sc) : স্ক্যানডিনেভিয়া নামে;

হ্যাফনিয়াম (Hf) : কোপেনহেগেন;

লুটেশিয়াম (Lu) : ফ্রান্সের ল্যাটিন নাম লটেশিয়া থেকে;

এমনই ইটেরিয়াম (Yt), টারবিয়াম(Tb), এরবিয়াম (Er)-এর নামকরণ হয়েছে।

ইটারবিয়াম(Yb) : সুইডেনের একটি ছোট্ট শহর 'ইট্টেরবি'-র নামানুরূপ। আবার এইসব মৌলবাহী কিছু খনিজের যেখানে সন্ধান মিলেছিল এবং খনিজগুলো থেকেই এই মৌলগুলো নিষ্কাষণ করা হয়েছিল। বোরন (B) : খনিজ উপাদান বোরাক্স (আরবী নাম বোরা (burah)-এর নামানুসারে রাখা হয়েছে।

আবার, কখনো প্রথিতযশা বিজ্ঞানীদের সম্মানার্থেও বেশ কিছু মৌলের নামকরণ হয়েছে, যেমন, আইনস্টাইনয়াম (Es) এসেছে মহামতি বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের নামে। অনুরূপে, ফার্মিয়াম (Fm) বিজ্ঞানী ফার্মির নামানুসারে হয়েছে। মেন্ডেলেভিয়াম (Md) নামটি এসেছে ডিমিত্রি মেন্ডেলিভ, লরেন্সিয়াম (Lr) এসেছে আর্নেস্ট লরেন্স-এর অবদান স্মরণ রেখে, ১০৯ পরমানু ক্রমাঙ্কের মৌল, মিইটনেরিয়াম (Mt) বিখ্যাত বিজ্ঞানী লিজে মেইটনার স্মরণে, ওগানেসন (Og) বিজ্ঞানী ইউরি

সোলাকোভিক ওগানেশিয়ান (বর্তমান বয়স ৯১ বছর)-এর নামানুসারে। এছাড়া, লৌহ, পারদ, গন্ধক ইত্যাদি নামের বহু ব্যাখ্যা রয়েছে তা এখানে স্বল্প পরিসরে বলা গেল না। এতৎসত্বেও উল্লেখ করতে হয়, সৌরজগতের গ্রহদের নাম অনুসরণ করেও আবার, অনেক মৌলের নামকরণ চিহ্নিত হয়েছে। যেমন-সেলেনিয়াম(Se) : গ্রীক ভাষায় চাঁদের নাম অনুকরণ করে; টেলুরিয়াম (Te) : গ্রীক ভাষায় টেরিস্টিয়াল-কে পৃথিবী; ইউরেনিয়াম (U) : ইউরেনাস গ্রহ-র নাম অনুযায়ী হয়েছে; অনুরূপে, নেপচুনিয়াম (Np) : নেপচুন গ্রহের নামানুযায়ী এবং প্লুটোনিয়াম (Pu) : সৌরজগতের বামন গ্রহ প্লুটো নাম থেকেই এসেছে। এছাড়া, কিছু কিছু মৌলের নামকরণ হয়েছে তাদের বিশেষ রাসায়নিক ধর্মের ওপর ভিত্তি করে। এই তালিকায় রয়েছে— হাইড্রোজেন, জল উৎপাদক হিসেবে; গ্রীক ভাষায় হাইড্রো অর্থ জল আর জেন বলতে উৎপাদক বোঝায়। অক্সিজেন (O) অম্ল উৎপাদনকারী (acid producer) মৌল; ফসফরাস (P)-কে আলো উৎপাদনকারী (গ্রীক শব্দ ফসফোর (Phosphor), বাংলা প্রতিশব্দ-আলো) আর কার্বন (C) এসেছে ল্যাটিন শব্দ Carbo (কয়লা) থেকে। এবার, অন্য দুটি মৌলের কথা বলি। কোবাল্ট (CO), জার্মান শব্দ Kobolt-এর অর্থ অপদেবতা (Trouble Maker)। আসলে, খনিজ আকরিক কোবাল্টাইট (Cobaltatite) থেকে কোবাল্ট ধাতু প্রথম নিষ্কাশন করা হয়েছিল। এই নিষ্কাশনের সময় বিষাক্ত আর্সেনিক যুক্ত ধোঁয়ার কারণে বহু শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। বহু কষ্টে সেই নিষ্কাশন পর্ব সফল হয়েছিল। তাই তাঁরা অনুমান করতেন, খনিতে অপদেবতার উপস্থিতির কারণেই তাঁদের এই দুর্গতি। ছাত্রবন্ধু ও পাঠক লক্ষ্য করবেন, বিজ্ঞানী ও কারিগরী বিশেষজ্ঞ হলেও তাঁরা কুসংস্কার মুক্ত নন। ভারতের আধুনিক রসায়ন চর্চার পথিকৃৎ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের উক্তি এখানে প্রণিধানযোগ্য। আচার্যদেব প্রসঙ্গক্রমে এক জায়গায় বলেছিলেন, "আমি ক্লাসে এত করিয়া ছাত্রদের পড়াইলাম, যে পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়িয়া চন্দ্রগ্রহণ হয়। তাহারা তা পড়িল, লিখিল, নম্বর পাইল, পাশ করিল। কিন্তু মজার ব্যাপার হইল যখন সত্যি সত্যি চন্দ্রগ্রহণ হইল তখন চন্দ্রকে রাহু গ্রাস করিয়াছে বলিয়া তাহারা ঢোল, করতাল, শঙ্খ লইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।" তাহলে, দেখা গেল, ধারাবাহিক অনুশীলন ও সচেতন চর্চা ব্যতিরেকে নিজেকে সংস্কার মুক্ত রাখা যায় না। আরো একটা উদাহরণ এখানে পেশ করছি। প্রথমে দূষণের ভয়াভয়তা প্রচারে যথার্থে অনুধাবন করে রাস্তার ধারে উপযুক্ত জায়গা বেছে চারা পোঁতা হলো, পরিচর্যা পেয়ে কয়েক বর্ষার জল, সূর্যের আলো ও খোলা বাতাস পেয়ে মহীরুৎ না হলেও বৃক্ষে পরিণত হওয়ার পর একদিন হঠাৎ-ই, দেখা গেল কাঁসর-ঘন্টা বাজিয়ে লোকের ভিড়ে জায়গাটা দেবভূমি সৃষ্টি হয়ে গেছে। ধর্মীয় সংস্কারের ঠেলায় পড়ে দূষণ নিরাসনের পরিবর্তে দূষণের উপকরণ মাত্রা বেড়ে গেল। কথা হল, পরিবেশ বাঁচানো সাথে ধর্মীয় সংস্কার, কোনটির গুরুত্ব তুলনায় জোর দিতে হবে। বিশ্ব পরিবেশ সংসার আলোচনার পরিসরে, COP29 সনদ মানার পরোক্ষে ধর্মীয় সংস্কার, এক্ষেত্রে কোনটার গুরুত্ব জোর দেওয়া হবে, এটিও একপ্রকার ধারাবাহিক সংগ্রাম। দূষণের ভারি বিষ বাতাসের হাত থেকে নিরাপদে বাঁচতে গিয়ে বৃক্ষের রোপন বা বনসৃজন আবশ্যিকই। এখন নিঃশ্বাস বায়ু ফুসফুসকে বিষের সঞ্চার থেকে রক্ষা সর্বাগ্রে বিবেচনায় আনা শ্রেয় মনে করি। এক অদ্ভুত সত্যের উপলব্ধি হল— মোটের ওপর পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি আর্থিক সহায়তা পান 'দেবতা' যার কোনো অর্থের দরকার নেই। প্রসঙ্গান্তে, এবার আলোচ্য বিষয়ে ফিরে আসি।

ট্যান্টালাম— গ্রিসের এক পৌরাণিক গল্প থেকে এসেছে, এই ধাতুর নাম।কথিত আছে, রাজা জিউসের প্রিয়পুত্র, ট্যান্টালাস একসময় দেবতাদের বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন। এর ফলে তাকে নির্মম শাস্তি পেতে হয়েছিল। একটি বিশেষভাবে নির্মিত জলাধারে তাকে তার গলা পর্যন্ত জলে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল যা তাঁর নাগালের বাইরে ছিল, ঠিক মাথার উপরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল সরস সুমিষ্ট ফলের গুচ্ছ। যখনই সে পিপাসার্ত হয়ে জল খেতে যেত, জল ঠিক তার ঠোঁটের কাছে এসে নীচে গড়িয়ে যেত। ক্ষিদে পেলে তার মুখের সামনে ঝুলন্ত ফল এলেই অমনি খেতে যেত, সাথে সাথে ফলের গুচ্ছ তার নাগালের বাইরে চলে যেত। যাই হোক, আবিষ্কার পর্বে খনিজ ট্যান্টালাইট থেকে ট্যান্টালাম ধাতু নিষ্কাশন করতে রসায়নবিদদের অসম্ভব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে পরিশ্রম করতে হয়েছিল। জিউস পুত্রের কষ্টের কাহিনি বিচার করে এই মৌলের নাম দেওয়া হয়েছিল ট্যান্টালাম। নিচের ক্লাসে ভাসমান বস্তুকণা বিষয়ক পাঠে 'ট্যান্টালাস কাপ'-এর বিবরণ হয়ত মনে আসছে। আরো একটা উদাহরণ অনায়াসে যোগ করা যায়। যেমন—

ফ্লোরিন (F) : এটা ইংরেজি নাম, এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'ফ্লুয়ো' থেকে, যার অর্থ "প্রবাহ"। রাশিয়ান পরিভাষায় 'ফ্লর' শব্দের অর্থ 'ধ্বংসকারী' বোঝায়। এই মৌলের আবিষ্কার এবং এর সামান্যতম পরিমাণের খোঁজে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে বিজ্ঞানীদের, এমনকি জীবনহানিও ঘটেছে আইরিশ আকাডেমি অফ সাইলেন্স-এর সদস্য নক্স (Knox)-এর, ফরাসি রসায়নবিদ নিকলেসে (Niklesse) এবং বেলজিয়াম গবেষক লায়েট (Layette)-এর। এছাড়াও শারীরিক আঘাতের শিকার হয়েছেন আরও অনেক গবেষক ও বিজ্ঞানী। বিশিষ্ট ফরাসি বিজ্ঞানী এ.ই. ফার্সম্যান এই মৌলকে বলেছেন 'সর্বভুক'। দীর্ঘ পরিশ্রমের শেষে ১৮৮৬ সালে ফরাসি বিজ্ঞানী হেনরি ময়সাঁ (Moissan) সফল হন। এই মৌলকে মুক্ত অবস্থায় সংগ্রহ করতে। জানা যায় ঐ বছরেই ২৬ জুন যখন তিনি প্যারিস আকাডেমি অফ সায়েন্সে ফ্লোরিনকে মুক্ত অবস্থায় পেতে তাঁর সাফল্যের বিবরণ দিয়েছিলেন তখন তাঁর এক চোখে কালো ব্যান্ডেজ বাঁধা ছিল। এই আবিষ্কারের জন্যে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি রসায়নে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন।

এবার আসি, রাসায়নিক মৌলের আবিষ্কারের ক্ষেত্রে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ভূমিকার কথায়। জ্যোতির্বিদরাই প্রথম প্রমাণ করেন যে নতুন মৌলের আবিষ্কার কেবলই রসায়নাগার আর খনিজ পদার্থের বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে একদা এক সূর্য গ্রহণের সময় ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী নরম্যান লকইয়ার আর ফরাসি জ্যোতির্বিদ পিয়ের জ্যানসেন, সূর্যের করোনার আলো-কে বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্রের প্রিজমের ভিতর দিয়ে পাঠিয়ে যে বর্ণালি লেখ (spectrum grap) সৃষ্টি করেছিলেন, সেইটিতে উজ্জ্বল হলুদ রঙের এমন কয়েকটা রেখা দেখতে পেয়েছিলেন যে রেখাগুলির সাথে পৃথিবীর পরিচিত মৌলদের দ্বারা পাওয়া রেখাদের কোন মিল ছিল না। সূর্যের বুকে এই পর্যবেক্ষণের পথ বেয়ে আবিষ্কার করলেন এক নতুন মৌল 'হিলিয়াম' (গ্রীক ভাষায় Helius শব্দের অর্থ সূর্য)। পরিশেষে বলি, শুধু মৌলদের আবিষ্কারের ইতিহাসের কাহিনি নয়, বৈচিত্রে ভরা রসায়ন বিজ্ঞানের জগৎ জুড়েই আছে আরো অসংখ্য বিস্ময়ের মেলা।

লেখক অবসরপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

e-mail: dr.asitkumarghosh@gmail.com • M. 8961228439

অসীম বসাক

সিরাম ব্যারাম

তপুদির কি যে হলো! কি হলো?

সহজ সরল তপুদি হঠাৎ বদলে গেছেন। আর তাতেই বেড়েছে তপুদির বিপদ। কি বিপদ?

আমার শঙ্কাদার বোন হচ্ছে তপুদি। কিছুদিন ধরে তার গাল বেশ চুলকাচ্ছে আর কেমন যেন লালচে ভাব হয়েছে। লাল লাল গুটি বেরিয়েছে। মাঝে মাঝে জ্বালাও করছে। কেন হয়েছে? কারণ কি?

সহজ সরল তপুদির গায়ের রং ততটা ফর্সা নয়। তার মুখটা ঝকঝকে ফর্সা করার বাসনা জেগেছে।

বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পড়ে তপুদি সিরাম কিনেছে।

সিরাম? রক্তের কোষ এবং জমাটবদ্ধ প্রোটিন অপসারণের পরে রক্তের যে পরিষ্কার তরল অংশ অবশিষ্ট থাকে তাকেই সিরাম বা রক্তাম্বু বা রক্ত তঞ্চন অপসারিত রক্তরস বলা হয়। আর সেই তরল কিনা লাগছে ফর্সা হওয়ার জন্য?

ছেলে মেয়ে সবাই এখন ফর্সা হতে চাইছে।

আর বিজ্ঞাপনের ফাঁদে বধ হচ্ছে অবোধ মানুষ।

প্রস্তুতকারিদের মত অনুযায়ী সিরাম হল এক ধরণের প্রসাধনী পণ্য যা আপনার ত্বকের সামগ্রিক স্বাস্থ্য এবং চেহারা উন্নত করতে পারে। এটি ত্বকের আর্দ্রতা রক্ষা করে, চামড়ায় ভাঁজ পড়া বা কুচকে যাওয়া কমায় ও ঢেকে দেয়, কপালে ও মুখে বলীরেখা ঢেকে বার্ধক্য লুকিয়ে রাখে মানে বেশ কচি কচি দেখায়। ত্বককে উজ্জ্বল করে ও মুখকে প্রশান্তিদায়ক করে। মুখের ব্রণ-চিহ্ন তথা গাঢ় দাগ দূর করে, নিস্তেজ ও শুষ্ক ত্বককে প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় করে।

সিরামগুলি তাদের উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে মুখ, ঘাড় বা শরীরের অন্যান্য অংশে ব্যবহার করা যেতে পারে। সিরামওয়ালারা আরও দাবি করেন যে ঐ তরল লোমকূপকে পরিষ্কার ও তেল-মুক্ত রাখে, মরা চামড়ার কোষগুলিকে পূনর্জন্ম দিয়ে ত্বকের মেরামতি করে, চামড়ায় ক্লান্তি বা অবসাদের চিহ্ন নির্মূল করে তাকে ঝকঝকে নির্মল ও কোমনীয় ভাব দেয়। তাদের দাবি অনুযায়ী সিরাম দেহে কোলাজেন বুস্টিং মানে বৃদ্ধি ঘটায়। ফলে ঝুলে পড়া বা ফুলে ওঠা ত্বক দৃঢ় ও টানটান হয়। এককথায় চেহারা বা লুকে জেল্লা আসে। আদৌ এসব হয় কিনা তা একমাত্র ব্যবহারকারী বা কাস্টমারই জানেন। বলে রাখি কোলাজেন হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন যা আমাদের দেহে একটি গঠনকারী উপাদান হিসাবে কাজ করে, আমাদের ত্বক, চুল, নখ, হাড় এবং সংযোগকারী টিস্যু বা তন্তুগুলি গঠন করে।

না, না। এ সিরাম সেই সিরাম নয়। এ এক দামী প্রসাধনী। এ সিরাম হল কৃত্রিম প্রোটিন-সমৃদ্ধ তরল যা ত্বকের আর্দ্রতা বা হাইড্রেশন রক্ষা করতে এবং চামড়ায় অ্যান্টি-এজিং বা বার্ধক্য লুকানোর জন্য ত্বকে প্রয়োগ করা হয়।

ঐ সিরামই তপুদির মুখের ব্যারামের কারণ।

চামড়ার প্রকৃতি আর বয়সের উপর নির্ভর ক'রে বাজারে অসংখ্য সিরাম বিকোচ্ছে মুড়ি-মুড়কির মতো। এর মধ্যে কোনওটি মুখের জন্য, কোনওটি দেহের জন্য আবার কোনটি দেহ ও মুখ উভয়ের জন্য। মোটামুটি এক থেকে পাঁচ মিলিলিটার থেকে শুরু করে সর্বাধিক ২০-৩০ মিলিলিটার আয়তনে ঐ সিরাম পাওয়া যায়।

দাম? ব্র্যান্ড ও উপাদানের উপর নির্ভর করে সিরামের মূল্য মোটামুটি দুশো টাকা থেকে শুরু করে বেশ কয়েক হাজার টাকা। একটু উজ্জ্বল ত্বকের জন্য আর বয়সের বলিরেখা লুকানোর জন্য এটুকু খরচ করতেই হয়!

কোটি কোটি টাকার সিরাম ব্যবসা! লক্ষ লক্ষ রূপশিল্পী, মডেল আর রূপোলি পর্দার নায়ক নায়িকারা দিন-রাত টাকা আর গ্ল্যামারের মোহে সিরামের মিথ্যে প্রচার করে চলেছেন। হাজার হাজার নামি দামী কেমিস্ট নিত্যনতুন রাসায়নিক মিলিয়ে তৈরি করছেন স্বপ্ন দেখানো শৌখিন আর ফর্সা হওয়ার তরল সিরাম। মুনাফা তুলছে বহুজাতিক 'রূপ-রসায়ন' বা

‘প্রসাধনী’ মানে ‘কসমেটিক্স’ ব্যবসায়ীরা আর প্রতারিত হচ্ছে রূপ-লোভী অবোধ জনগণ।

সিরাম কত প্রকার?

ত্বকের চরিত্র ও প্রসাধনী চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের সিরাম পাওয়া যায়। যেমন, অ্যান্টি-এজিং বা বার্ধক্যরোধী, হাইড্রেটিং বা আর্দ্রতা রক্ষাকারী, ত্বক উজ্জ্বলকারী, ব্রণ নিবারণী, ত্বকে শীতল প্রশান্তিদায়ক, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, এক্সফোলিয়েটিং বা মরা ত্বক-কোষ ওঠানোর সিরাম, ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা ও দৃঢ়তা বৃদ্ধিকারী বা ফার্মিং সিরাম, চোখের চারপাশে কালো রেখা ও ফোলাভাব দূর করার সিরাম, স্পট ট্রিটমেন্ট সিরাম।

কি আছে প্রসাধনী সিরামে? বলছি।

এই সব সিরামগুলি মূলত ১) তেল ভিত্তিক ২) জেল ভিত্তিক ৩) জল ভিত্তিক ৪) ইমালসন সিরাম বা ৫) সুগন্ধ সিরাম। এই বিভিন্ন ধরনের সিরামে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। তবে সাধারণভাবে সিরাম তৈরি করতে লাগে সক্রিয় উপাদান, দ্রাবক ও সহায়ক উপাদান।

সিরাম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, যেমন ত্বকে জ্বালা, ঝিঁঝির অনুভূতি, লালচে ভাব, চুলকানি, ত্বকে পোড়া দাগ, হুল ফোটার মত

ব্যথা, চামড়ায় শুষ্কতা ও কালো দাগ, অ্যালার্জি ও কিছু ক্ষেত্রে বিরল অ্যানাফিল্যাকটিক শকের কারণ হতে পারে। অ্যানাফিল্যাক্সিস মানে প্রাণঘাতী অ্যালার্জি। তপুদির মুখেও সিরামের জন্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। একা তপুদি নয় অসংখ্য মানুষের রোজ ঐ সিরাম মেখে শরীরে একাধিক পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া সহ বিভিন্ন অসুখ যেমন, হরমোনের ব্যাঘাত, প্রজনন সমস্যা এমনকি ক্যান্সার দেখা দিচ্ছে।

সাবধান!

কেন? কি কি থাকে সিরামে? হায়ালুরোনিক অ্যাসিড, হাঙ্গরের লিভার বা উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত সম্পৃক্ত তেল স্কোয়ালেন; পেপটাইডস ও নিয়াসিনামাইড; ভিটামিন সি, লিকোরিস মুলের নির্যাস ও গ্লাইকোলিক অ্যাসিড; স্যালিসিলিক অ্যাসিড ফেরুলিক অ্যাসিড; উদ্ভিদ স্টেম সেল, আলফা ও বিটা হাইড্রক্সি অ্যাসিডস, সবুজ চা নির্যাস আরও অনেক কিছু মিশিয়ে সিরাম বানানো হয়। হায়ালুরোনিক অ্যাসিড ও স্কোয়ালেন ত্বককে আর্দ্র ও মোলায়েম করে। পেপটাইডস ও নিয়াসিনামাইড কোলাজেন উৎপাদন উদ্দীপিত করে ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা বাড়ায়। ত্বক উজ্জ্বল করাতে লাগে ভিটামিন সি, লিকোরিস নির্যাস ও গ্লাইকোলিক অ্যাসিড। রেটিনল ত্বকে সূক্ষ্ম রেখার দাগ দূর করে আর গ্লাইকোলিক অ্যাসিড মরা কোষ তুলে ফেলে। স্যালিসাইলিক অ্যাসিড চামড়ার ছিদ্র পরিষ্কার করে ও ব্রণ কমায়। ফ্রি র‍্যাডিক্যালকে প্রতিহত করে ফেরুলিক অ্যাসিড। উদ্ভিদ স্টেম সেল ত্বকের পুনর্নবীকরণ করে বার্ধক্যের লক্ষণ কমায়। মরা কোষ তুলে চামড়াকে টানটান করে আলফা ও বিটা হাইড্রক্সি অ্যাসিডস আর ত্বককে আরাম দেয় সবুজ চা নির্যাস।

সিরাম বানাতে দ্রাবক হিসাবে জল বা ইথানল, গ্লাইকল, টলুইন লাগে। সহায়ক উপাদান যেমন, তেল-জলের মিশ্রণকে স্থিতিশীল করতে ইমালসিফায়ার সিটাইল অ্যালকোহল, গ্লিসারিল স্টিয়ারেট থাকে। সংরক্ষক বা প্রিজারভেটিভ হিসাবে প্যারাবেনস, বিউটিলেটেড হাইড্রোক্সিআনিসোল, ফেনোক্সিইথানল ব্যবহার করা হয়। অম্লত্ব ক্ষারত্ব মাত্রা রক্ষাকারী বা পিএইচ অ্যাডজাস্টার ট্রাইইথানোলামাইন আর মাধ্যম গাঢ়কারক বা থিকনারস হিসাবে কারবোমার মানে এক্রাইলিক অ্যাসিডের কৃত্রিম পলিমার, জ্যান্থান আঠা ইত্যাদি লাগে।

প্যারাবেনস, থ্যালেটস, বেনজোফেনন, বিসফেনল, পলিফ্লুরো অ্যালকিল যৌগ, ডাইমিথাইলল-ডাইমিথাইল হাইডানটোইন, ট্রাইক্লোসান, কৃত্রিম সুগন্ধি, কৃত্রিম রং ও অন্যান্য রাসায়নিক ত্বকের জ্বালা, শ্বাসকষ্ট, হরমোনের ব্যাঘাত, প্রজনন সমস্যা এমনকি ক্যান্সারের কারণ। ত্বকের গভীরে প্রবেশ করার সিরামগুলিতে একাধিক রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়, এইগুলি রক্ত প্রবাহে মিশে দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলির ক্ষতি করে। রেটিনল ও ভিটামিন-ই হরমোনের কার্যকারিতায় ক্ষতি করতে পারে, ফলে থাইরয়েড সমস্যা বা হরমোনের ভারসাম্যহীনতা জনিত অসুখ হতে পারে। সিরামে থাকা বামন কণা বা ন্যানো পার্টিকেল যেমন, টাইটেনিয়াম ডাইক্সাইড, জিঙ্ক অক্সাইড ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে রেটিনল ও রেটিনল সঞ্জাত যৌগ ত্বকে প্রবেশ করে রক্তে মিশে যায় ও গর্ভবতী ভ্রূণের ক্ষতি করে। একই রকম ক্ষতি করে অ্যাকুটেন যা ব্রণ সারানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। হাইপারপিগমেন্টেশনের কারণে কালো ত্বককে হালকা করতে হাইড্রোকুইনোন ব্যবহৃত হয়, এটিও ভ্রূণের ক্ষতি করে।

প্রসাধনী ও পরিবেশ

বিশ্বজুড়ে প্রসাধনী ও রূপচর্চার পণ্যগুলি বিপুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। নিয়মিত ব্যবহারের পরে এগুলির অবশেষ বা ধোওয়া অংশ ক্রমাগত পরিবেশে মিশছে। থ্যালেট যৌগ, গ্লাইকল, প্যারাবেনস, ট্রাইক্লোসান, রেটিনল, কৃত্রিম রং, কৃত্রিম সুগন্ধি ন্যানো পার্টিকেলস, মাইক্রো ও ন্যানোপ্লাস্টিকস মাটি জল ও বায়ুকে দূষিত করছে। এছাড়াও ঐ সব প্রসাধনী দ্রব্যের ব্যবহৃত পাত্র ও প্যাকেটগুলিও অর্থাৎ জঞ্জালগুলি পরিবেশে জমেই চলেছে। ফলে জনস্বাস্থ্য, বাস্তুতন্ত্র তথা পরিবেশের ক্ষতি বেড়েই চলেছে।

হাজার হাজার টাকা খরচ করে ফর্সা হওয়ার কি বিপদ!

তাহলে কি আমরা রূপচর্চা করব না?

প্রাচীন ভারতীয় রমণীরা ত্বককে উজ্জ্বল করার জন্য হলুদ ও চন্দন এবং আর্দ্র করার জন্য নারকেল তেল এবং তিলের তেল ব্যবহার করতেন। চিনাদেশে ত্বক উজ্জ্বল করার জন্য জেড (সোডিয়াম ও ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম আয়রন সিলিকেট হাইড্রক্সাইড যৌগ) ও মুক্তা (ক্যালসিয়াম কার্বোনেট) পাউডার, পুনরুজ্জীবনের জন্য জিনসেং ও গ্রিন টি আর ত্বক শীতল করার জন্য কর্পূর ও মেন্থল ব্যবহার করা হত। গ্রীক ও রোমানরা ত্বক ফর্সা করার জন্য চক (ক্যালসিয়াম কার্বোনেট) ও ভিনিগার মানে অ্যাসেটিক অ্যাসিড, দাগ দূর করার জন্য বেরি বা জাম জাতীয় ফল ও ওয়াইন মানে ইথানল আর আর্দ্র করার জন্য জলপাই তেল এবং মধু ব্যবহার করত। মিশরীয়রা ত্বক আর্দ্র রাখতে মোম ও জলপাই তেল ব্যবহার করত। আফ্রিকার মানুষেরা ত্বক আর্দ্র করার জন্য শিয়া মাখন ও নারকেল তেল, দাগ তোলার জন্য বেরি ও কাদামাটি এবং ত্বককে শীতল ও প্রশমিত করার জন্য অ্যালোভেরা জেল ব্যবহার করত।

প্রাকৃতিক রূপচর্চা

তবে কয়েকটি প্রাকৃতিক উপাদানের নাম বলতে পারি যেগুলি ব্যবহার করে নিরাপদ ও পরিবেশ বান্ধব রূপচর্চা করা যায়। যেমন, মুখসহ সারা শরীরের জন্য টক দই, মধু, কাঁচা হলুদের মলম, শসা ও টমেটোর রস, পাকা পেঁপের কাঁথ, অ্যালোভেরা জেল, সবুজ চা নির্যাস, গ্লিসারিন, ডাবের জল, জবা-পাপড়ির নির্যাস, বেসন, নিম পাতার নির্যাস ব্যবহার করা যায়। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের অপরিহার্য (essential) তেল যেমন, চা গাছের তেল, ল্যাভেন্ডার তেল, গোলাপ তেল, ক্যামোমাইল নির্যাস ও তেল যেমন, নারকেল তেল, জোজোবা তেল ও মিষ্টি বাদাম তেল ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এই নির্যাস ও তেলে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রাবক থাকে। তাই এগুলিকে এড়িয়ে চলাই ভালো।

শেষে বলি পেটে খেলে পিঠে সয়, এতো কভু মিছে নয়। তাই ত্বককে উজ্জ্বল ও স্বাস্থ্যকর করতে সুষম আহার প্রয়োজন। এখানে কিছু খাবারের কথা বলছি যা আপনার ত্বকসহ সারা শরীর ও মনের উপকার করবে:

১. অসম্পৃক্ত চর্বি, প্রোটিন ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ বাদাম এবং বীজ। যেমন, সূর্যমুখী, ছোলা, মটর, চিনা বাদাম, তিল, খোসা সমেত মুগ, কুমড়ার বীজ, ভুট্টা, গম, যব, সয়াবিন, রাজমা, বাজরা, রাগি, লাল চাল, ওটস, বার্লি, অ্যামণ্ড, আখরোট, পেস্তা।

২. অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, তন্তু ও ভিটামিন সমৃদ্ধ সবুজ ও রঙ্গিন শাকসব্জি। যেমন, লাউ, কুমড়া, নটে, পালং, লাল শাক ইত্যাদি।

৩. অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন সি ও ফাইটোকেমিক্যাল সমৃদ্ধ ফল ও সব্জি। যেমন, লেবু, আপেল।

৪. অঙ্কুরিত বীজ, ৫. চর্বিযুক্ত ছোট মাছ, ৬. গাঁজনযুক্ত খাবার। যেমন, চর্বিহীন টক দই।

৭. মিষ্টি আলু, কুমড়া, গাজর, বীট, শিম, টমেটো (বীজ ও লতলতে তরল বাদে), লাউ, কুমড়ো, চাল কুমড়ো, সসা, আরও বিভিন্ন সব্জি।

৮. ডিম ,কলা, আমলকী , তেঁতুল ও বিভিন্ন মরশুমি ফল ও শাকসব্জি, মাশরুম, কাঁচা পেয়াজ, লঙ্কা, আদা, রসুন ও বিভিন্ন মশলা।

বাদ দিন

চিনি ও চিনিজাত খাবার, দুধ, প্রক্রিয়াজাত মধু, পাউরুটি, বিস্কুট, কুকিজ, কেক, নুডলস, মোমো, আরও অনেক ফান বা ফাস্ট ফুড খাবেন না, তেলে ভাজা, তেল না খেতে পারলে ভালো, পানীয় (নরম, স্বাস্থ্য ও নেশা), ধূমপান, সুপারি, পান মশলা, খয়ের, সমস্ত তামাক জাত দ্রব্য, সুগন্ধি বাদ দিন।

ভালো থাকুন

পরিশ্রম করুন, রোজ হাঁটুন, ব্যায়াম করুন, বই পড়ুন, রেডিও শুনুন, লৌকিক জিনিস নিয়ে ভাবুন। কম খান আর বোতলবন্দী জল ও আর ও ফিল্টার জল, যে কোনও ধরনের প্লাস্টিক এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার বর্জন করুন। ভালো থাকুন।

নিজের জিনে থাকা বৈশিষ্ট্য মানে জন্মগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে মেনে নিয়ে সুস্থ থাকাই পরিবেশ ও প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার পক্ষে মঙ্গলদায়ক।

তথ্যসূত্র :

1. Kwa M, Welty LJ, Xu S. Adverse Events Reported to the US Food and Drug Administration for Cosmetics and Personal Care Products. JAMA Intern Med. 2017; 177 : 1202-1204. [PMC free article] [PubMed]
2. Taylor KW, Troester MA, Herring AH, et al. Associations between Personal Care Product Use Patterns and Breast Cancer Risk among White and Black Women in the Sister Study. Environ Health Perspect. 2018; 126 : 027011. [PMC free article] [PubMed]
3. Herndon JH, Jr, Jiang LI, Kononov T, Fox T. An Open Label Clinical Trial to Evaluate the Efficacy and Tolerance of a Retinol and Vitamin C Facial Regimen in Women with Mild-to-Moderate Hyperpigmentation and Photodamaged Facial Skin. J Drugs Dermatol. 2016; 15 : 476-82. [PubMed]
4. Mahé A, Ly F, Aymard G, Dangou JM. Skin diseases associated with the cosmetic use of bleaching products in women from Dakar, Senegal. Br J Dermatol. 2003; 148 : 493-500. [PubMed]
5. Nakagawa M, Kawai K, Kawai K. Contact allergy to kojic acid in skin care products. Contact Dermatitis. 1995; 32 : 9-13. [PubMed]

লেখক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক, বিজ্ঞান প্রচারক ও রসায়ণ গবেষক

e-mail: asimkrbasak@gmail.com • M. 9432773785

কৌশিক রায়

চন্দ্রায়নের নতুন পর্ব

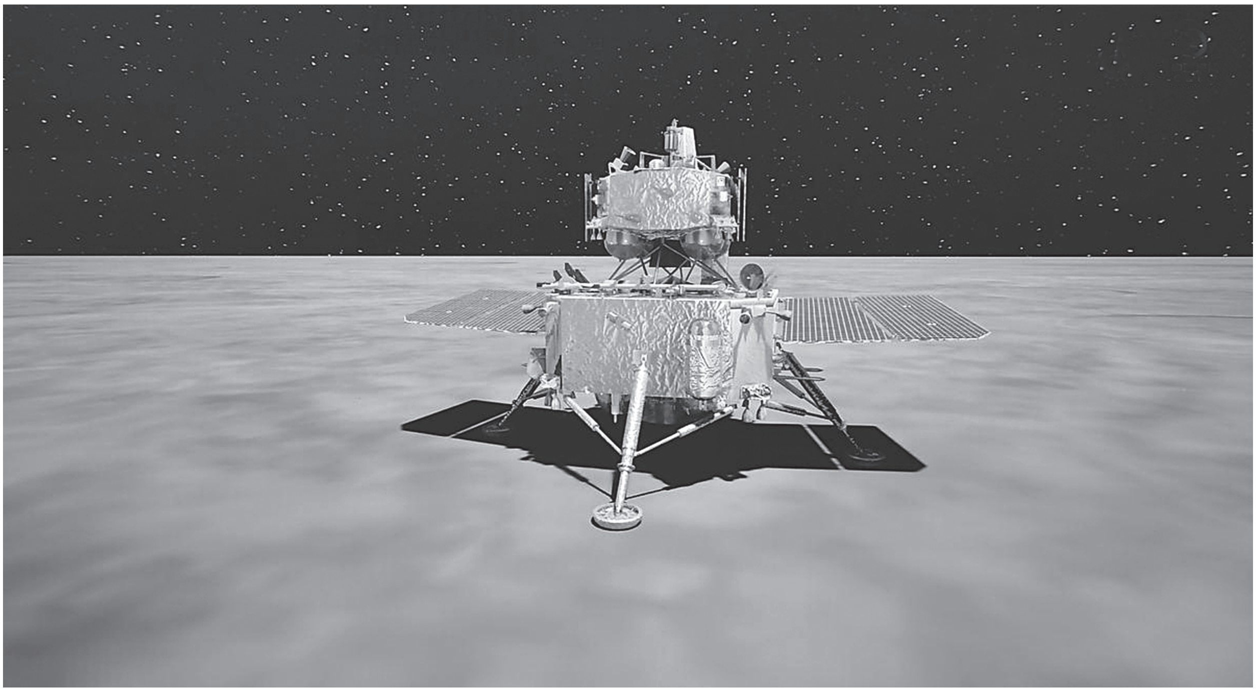

১৯৬৯ সালে চাঁদের মাটিতে পা রেখেছিলেন নীল আর্মস্ট্রং এবং এডউইন অলড্রিন। মহাকাশ বিজ্ঞানের নতুন জয়যাত্রা ঘোষিত হয়েছিল সেদিন। শেষমানব হিসেবে ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে অ্যাপোলো ১৭ নামক মহাকাশযানে করে চাঁদের মাটিতে পা রাখেন মহাকাশচারী হ্যারিসন স্মিট। তার আগে চাঁদের মাটিতে অন্যান্য আমেরিকান হিসেবে পা রেখেছেন রিচার্ড গর্ডন, ইউজিন সেরনান এবং অ্যালান বীন। তবুও চাঁদকে ঘিরে মানুষের উচ্চাশার নিবৃত্তি হয়নি। তাই নতুন করে চন্দ্রবিজয়ের দিকে এগোচ্ছে মানুষ।

বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারিভাবেও ব্যক্তিগত উদ্যোগে চন্দ্রবিজয়ের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। ধনকুবের রিচার্ড ব্র্যানসনের সংস্থা ভার্জিন গ্যালাক্টিক-এর তৈরি মহাকাশযান— “ভি.এস.এস. ইউনিটি”, মাটি থেকে ৫০ কিমি পর্যন্ত উপরে উঠেছে। বেসরকারিভাবে মহাকাশ অভিযানের প্রথম ধাপ হিসেবে এটিকে গণ্য করা হচ্ছে। চাঁদের ও মঙ্গল গ্রহের মাটিতে মহাকাশচারীরা ভবিষ্যতে যে পোশাক বা স্পেস স্যুট পরে নামবেন তার একটা পরিকল্পনা তৈরি করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ডাকোটা বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশেষ স্পেস স্যুট পরলে হিমাঙ্কের নিচে ৮০ ডিগ্রি ফারেনহাইট এবং হিমাঙ্কের উপরে ৭০ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রাকে সহ্য করা যাবে। “বোয়িং” সংস্থা থেকে সি.এস.টি. ১০০ স্টারলাইনার নামক একটি মহাকাশযান তৈর করা হয়েছে। এই মহাকাশযানে করে ৫ জন পর্যন্ত যাত্রী মহাকাশে যেতে পারেন। মহাকাশযানটিতে পতনবেগ রোখার জন্য বিশেষ প্যারাশুট ও এয়ারব্যাগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চাঁদের পাথর ও ধুলোর নমুনা সংগ্রহ করার জন্য মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা—“নাসা” থেকে একটি রোবট চালিত প্ল্যাটফর্মযুক্ত গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে। গাড়িটির নাম “র‍্যাসোর”। চাঁদের মতো কম মাধ্যাকর্ষণযুক্ত পরিবেশে গাড়িটি চলাফেরা করতে পারে। গাড়িটিতে পাথর আর ধুলো ওঠানোর জন্য দুটি বালতি আছে— যেগুলি ঘর্ষণ আর ওজনের ওপর নির্ভরশীল নয়। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত ১২ জন আমেরিকান, চাঁদে পদার্পণ করেছেন। আশা করা যাচ্ছে আরো বিভিন্ন দেশের মানুষ, চাঁদের মাটিতে পা ফেলবেন। মানুষের পদচিহ্ন অঙ্কিত হবে মঙ্গল গ্রহের মাটিতেও। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মহাকাশযান উৎক্ষেপণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। এগুলির বেশিরভাগই দক্ষিণ গোলার্ধে, বিষুবরেখার দক্ষিণে অবস্থিত। কেননা এখানে পৃথিবীর ঘূর্ণনবেগ বেশি। তার ফলে রকেট উৎক্ষেপণে সুবিধা হয়। দক্ষিণ আমেরিকার ফরাসি গায়ানা, জাপানের তানেগাশিমা এবং উচোনিয়োরা, নিউজিল্যান্ড, মার্শাল আইল্যান্ডস, চিনের কিচাং, জাকুয়াং এবং তাইইয়াং অঞ্চলে মহাকাশ উৎক্ষেপণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। চিন থেকে একটি মনুষ্যবিহীন মহাকাশযানও চাঁদে পাঠানো হয়েছে। চিন ঘোষণা করেছে— চাঁদের দক্ষিণতম প্রান্তে তারা একটি গবেষণা কেন্দ্র, আগামী দশকের মধ্যেই গড়ে তুলবে। ইজরায়েলের একটি বেসরকারি সংস্থা থেকে পাঠানো মহাকাশযান চাঁদকে প্রদক্ষিণ করেছে। অবশ্য চাঁদের মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছে ইজরায়েলি মহাকাশযান “বেরেশিত” বা “সৃষ্টি”। দুবাইতে মরুভূমির মধ্যে মহাকাশযান উৎক্ষেপণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে।

অনেক ধনকুবেরও মহাকাশ পর্যটনের দিকে মন দিয়েছেন। আমাজন বিপণন-এর স্থপয়িতা জেফ বেজোস এই ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন। তাঁর সংস্থা, “ব্লু ওরিজিন” এই ব্যাপারে কাজ করে চলেছে। মধ্য এশিয়ার কাজাখস্তানেও আরো কয়েকটি মহাকাশযান উৎক্ষেপণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। অবশ্য, এখান থেকে পাঠানো একটি মহাকাশফেরীর দুর্ঘটনা থেকে প্রাণে বেঁচেছিলেন নাসার মহাকাশচারী নিক হেগ এবং

রুশ মহাকাশচারী আলেক্সেই ওভচিনিন। কাজাখস্তানের বাইকোনুর কসমোড্রেমে থেকে আরো অনেক মহাকাশযান পাঠানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেপ ক্যানাভেরাল-এ বোয়িং ও লকহিড মার্টিন সংস্থার উদ্যোগে মহাকাশযান পাঠানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবে মহাকাশ অভিযানের গতি বাড়াতে হলে জ্বালানি হিসেবে মানুষকে আরো বেশি জল, হিলিয়াম থ্রি এবং অক্সিজেন যোগাড় করতে হবে। নাসার পূর্বতন প্রধান টমান ও

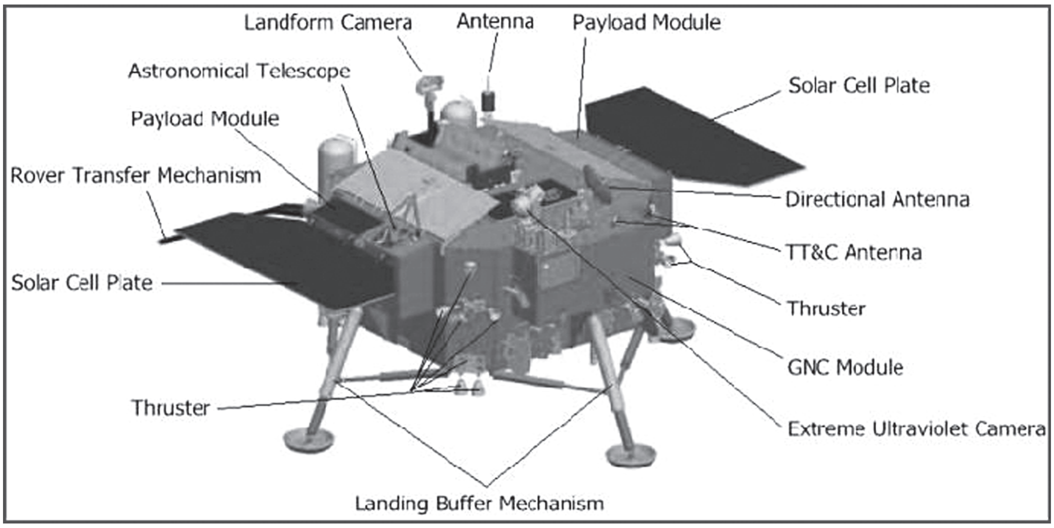

পেইন মনে করেন তাহলে আমরা মঙ্গল ও বৃহস্পতির দুই উপগ্রহ আইও ও ইউরোপেতে পা রাখতে বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য নয়, আর্থিক মুনাফার দিকেই ঝুঁকে পড়ছে বেশি। চেষ্টা চলছে কোনও মহিলাকে চাঁদের দেশে পাঠানোর। আরও কম সময়ে যাতে চাঁদে ও মঙ্গল গ্রহে নামা যায় তার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। তবে মহাকাশযান তৈরি করতে গিয়ে কৃত্রিম উপগ্রহ বিধ্বংসী মিসাইল যাতে কোনও দেশ তৈরি না করে তার জন্য বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন। মহাকাশে "স্যালিউৎ" ও "মির" এর মত আরও কিছু মহাকাশ স্টেশন গড়ে তোলা হবে। বৃহত্তর মানবকল্যানের জন্য ভবিষ্যৎ মহাকাশ গবেষণাকে কাজে লাগানো হবে। মহাকাশ অভিযানের অতীতের সাথেই জড়িয়ে থাকে তার ভবিষ্যৎ। সুতরাং মহাকাশ অভিযানের অতীতের পৃষ্ঠাগুলোকে আরেকবার জেনে নেওয়া দরকার। বর্তমানের স্পেস স্যুট তৈরির পিছনে অনেকটাই অনুপ্রেরণা হয়ে আছে ১৯৬২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি মহাকাশে যাওয়া মার্কিন মহাকাশচারী জন গ্লেন-এর ২৭টি জিপারযুক্ত স্পেস স্যুট। ১৯৬০ সালের ১৯ আগস্ট একটি সোভিয়েত মহাকাশযানে করে মহাকাশ থেকে ঘুরে এসেছিল স্ট্রেইকা এবং সেল্‌কা নামক দুটি কুকুর, একটি খরগোশ, দুটি ইঁদুর, ৪০টি নেংটি ইদুর এবং বেশ কয়েকটি মাছি। মহাকাশফেরী বা স্পেস শাটল তৈরি করার প্রতিযোগিতা শুরু হয় আমেরিকা এবং রাশিয়ার মধ্যে। তৈরি হয় "কলম্বিয়া" আর "বুরান"-এর মত মহাকাশফেরীগুলি। ট্রেনে করে বাইকোনুর মহাকাশ উৎক্ষেপণ কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় সোয়ুজ মহাকাশযানটিকে। তৈরি করা হয় এক্সট্রাভেহিক্যুলার অ্যাক্টিভিটি স্পেস স্যুট, ইন্ট্রাভেহিক্যুলার অ্যাক্টিভিটি স্পেস স্যুট, উইনি মেয়ি, এক্স-ফিফটিন, মার্কারি, জেমিনি এবং অ্যাপোলো স্পেস স্যুট। বর্তমানে ১২২ পাউন্ড ওজনের শাটল। আই.এস.এস., স্পেস স্যুট তৈরি করা হচ্ছে। সম্প্রতি মহাচিনের প্রেরিত "চ্যাং ই-৪" নামক স্বয়ং চালিত মহাকাশযানটি চাঁদে অবতরণ করেছে। আরো ৬০টি উপগ্রহে অনুসন্ধান ক্যালিস্টো, গ্যানিমিড, থিবি, মেটিস, অ্যাড্রাসটি আর অ্যামালথিয়া উপগ্রহগুলিতে জীবনের সন্ধান আছে কিনা সেটিকে জানার জন্য স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযান পাঠানো হচ্ছে। শনিগ্রহের টাইটান, টেথিস, প্যান্ডোরা, অ্যাটলাস, দাফনি উপগ্রহ, নেপচুন-এর নেরেইড, ট্রাইটন, প্রোটিয়াস, থ্যালাসা, ইউরেনাসের উমব্রিয়েল, টাইটানিয়া, ওবেরন, মিরান্দা, বেলিন্দা, রোসাফিল্ড, প্লুটোর হাইড্রা, স্টিক্স, ব্যারন উপগ্রহগুলিতেও স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযান পাঠানোর উদ্যোগ চলছে। চাঁদ থেকে মহাকাশচারীরা এই পর্যন্ত ৮৪২ পাউন্ডের মত পাথর এবং খনিজ দ্রব্যের নমুনা নিয়ে এসেছেন। অ্যাপোলো ৮ মহাকাশযান থেকে নীল পৃথিবীগ্রহের বিখ্যাত ফোটোগ্রাফটি নিয়েছিলেন মার্কিন মহাকাশচারী উইলিয়াম অ্যান্ডার্স। জেমিনি থ্রি মহাকাশযানে করে স্যান্ডউইচ নিয়ে ভাগ করে খেয়েছিলেন দুই মহাকাশচারী জন ইয়াং এবং গাস গ্রিসম। চাঁদে নামার মুহূর্তটিকে উদ্‌যাপন করার জন্য রুটি, কেক এবং অন্যান্য খাবার, অ্যাপোলো ১১ মহাকাশযানে করে নিয়ে গেছিলেন নীল আর্মস্ট্রং-এর সহ-মহাকাশচারী এডউইন "বাজ" অলড্রিন। রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের তৈরি প্রথম বিমান "ফ্লাইয়ার ওয়ান"-এর একটি কাঠের প্রপেলারের টুকরো এঁরা মহাকাশে নিয়েও গেছিলেন। চাঁদে গল্ফ খেলার সরঞ্জাম, অ্যাপোলো ১৪ মহাকাশযানে করে নিয়ে যান অ্যালান শেপার্ড।

অ্যাপোলো ১৬ মহাকাশযানে করে পারিবারিক ফোটোগ্রাফ নিয়ে গিয়ে চাঁদের দেকার্ত আইল্যান্ড নামক অঞ্চলে রেখে আসেন মহাকাশচারী চার্লস ডিউক। মহাকাশ অভিযানে নিহত নভোচারীদের স্মরণে, চাঁদের মাটিতে একটি অ্যালুমিনিয়ামের মনুষ্যমূর্তি রেখে আসেন অ্যাপোলো ১৫-র মহাকাশচারী ডেভিড স্কট। নীল আর্মস্ট্রং-এর চন্দ্রাবতরণ-এর আগেই ১৯৬৭ সালের ১০ জানুয়ারি চাঁদে নামার একটা দুর্দান্ত ছবি, অনুমান করে এঁকে ফেলেছিলেন নরম্যান রকওয়েল। চাঁদে এবং অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহে অভিযান নিয়ে অসাধারণ সায়ান্স ফিকশন "২০০১ আ স্পেস ওডিসি" লিখে ফেলেছিলেন আর্থার সি. ক্লার্ক। বইটিকে নিয়ে সিনেমাও করেছিলেন স্ট্যানলি কুব্রিক। মহাকাশ অভিযানের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে তোলা হয় ফ্ল্যাশ গর্ডন, জেফ হক, টেকস্ বেনসন, বাক রজার্স-এর মত কমিকস্ চরিত্রগুলি। মাইকেল জ্যাকসন-এর "মুনওয়াকিং" নাচ আর বনি এম রক ও পপ গায়কগোষ্ঠীর "নাইট ফ্লাইট টু ভেনাস" গানটি মহাকাশ অভিযানের ওপরই ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। মহাকাশযানের আদলে ১৯৫৮ সালে গ্যাস টারবাইন চালিত "ফায়ারবার্ড থ্রি" মোটরগাড়িটি তৈরি করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল মোটরস্। এভাবেই অনন্ত মহাশূন্য যেন আমাদের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে।

লেখক শিক্ষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

M. 9547659689

র ণ জি ৎ পা ল

সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ

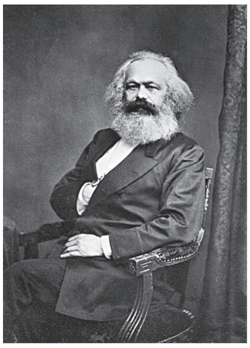

কার্ল মার্ক্স

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

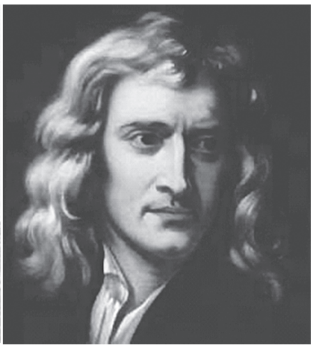

আইজ্যাক নিউটন

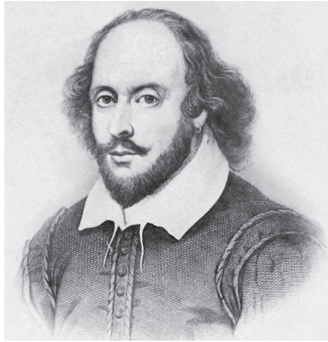

উইলিয়াম সেক্সপিয়র

পল ম্যাকারটনি

বিবিসির ইন্টারনেটে সমীক্ষায় গত এক হাজার বছরে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম চিন্তাবিদকে এই প্রশ্নে পৃথিবীর নানা দেশের জনগণ থেকে নেওয়া ভোটে নির্বাচিত হন কার্ল মার্ক্স। বেশ কিছু কম ভোট পেয়েছেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ও আইজ্যাক নিউটন। আরও আছে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক উইলিয়াম শেক্সপীয়ার এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সুরস্রষ্টা পল ম্যাকারটনি নির্বাচিত হন। মজার কথা, তিনজনই ইংল্যান্ডের অধিবাসী। কার্ল মার্ক্স শেষজীবনে। বলাই বাহুল্য, বিবিসি-র স্থায়ী ঠিকানা ইংল্যান্ড।

অতীতে একসময় ইংরেজ সাম্রাজ্যে সূর্য কখনও অস্ত যেত না। এই বাক্যবন্ধ গৌরবকে মহিমান্বিত করার জন্য তৈরি। সারাবিশ্বে বাণিজ্যের বাহানায় অধিষ্ঠিত হয়ে পরে ছলনার দ্বারা শাসকের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, শাসিতের সম্পত্তি লুঠ করতে বাধেনি। নির্মম নিষ্ঠুর হতেও বাধেনি। ইংল্যান্ডের অর্থনীতি মূলত যা বাণিজ্য এবং আধিপত্য বিস্তার করতে এমন নীতিহীন গর্হিত কাজ করতে আটকায়নি। ঐ সমস্ত লুণ্ঠিত বহুমূল্য সম্পদ সামগ্রীর বর্তমান বাজারদর কমবেশি পনের লক্ষ কোটি পাউন্ড, যা ডলার মূল্যের নিরিখে আরও কয়েক লক্ষ কোটি বেশি। বিভিন্ন উপনিবেশের দেশ তাদের লুণ্ঠিত সম্পত্তির ফেরত চাইছে। 'কোহিনূর হীরা' তারই একটি, ভারতীয়দের দাবি। অধুনা ইংল্যান্ডের 'সেই অধিষ্ঠানের আসন' জীর্ণ হয়ে ভেঙে পড়ার উপক্রম। ক্রমেই নীচের দিকে নেমে লুপ্ত হতে চলেছে। সেই হৃতগৌরব ওঅহংকারকে পুনর্বাসন দিতেই বিবিসি-র এই সাম্প্রতিক উদ্দেশ্য তথা উদ্যোগ। প্রশ্নের চরিত্র ও গুণমান এবং উত্তরদাতা নির্বাচন বিবিসি-র খুশীমত। রয়টার্সের প্রতিবেদনে তা জানা যায়নি। প্রশ্ন নির্বাচনে কারসাজি ও কেরামতিতে এমন প্রশ্ন সম্ভব যে ক্যুইজের উত্তর— নদী যেমন সমুদ্রে মিলিত হয়, তেমনই বিকল্প কোন উত্তর হওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র তস্কর ও জিপসীরা বলে থাকে, তাদের দুষ্কর্মের অকুস্থলে ফি যাওয়া উচিত নয়। ইংল্যান্ডের অর্থনীতি বা ইংরেজদের সামাজিক দুরবস্থা এমনই যে, আপ্তবাক্য তার মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে দেয়নি। কেন এই দ্বিমত তা জানাতে এই নিবেদন।

পিছন ফিরে দেখা যাক কে কি বলেছেন, মহামূল্যবান মার্ক্সীয় মতবাদ সম্পর্কে! "উই হ্যাভ মুভড্ আউট অফ কম্যুনিজম ইন দি মোস্ট অ্যাবসার্ড দি মোস্ট পেইনফুল ওয়ে— বলেছেন এক প্রথিতযশা রুশ সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক এবং নোবেল পুরস্কার বিজয়ী। আলেকজান্ডার সলঝেনিৎসিন। তিনি একা ও একমাত্র নন, হেনরি বেক বলেছেন— "সাম্যবাদের ত্রুটি হল, আমরা শুধু নিজেদের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গেই এই সমতা চাই।" হারবার্ট জোসেফ মিলার আরও 'খুল্লম খুল্লা' বক্রোক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন— "মহান বৈপ্লবিক চিন্তাবিদরা হলেন শুধু তারাই যারা চূড়ান্ত হিংস্রতার সঙ্গে নষ্ট করেছেন ঐতিহ্য পরম্পরাগত সভা সংগঠনগুলি। কার্ল মার্ক্স ছিলেন এক দার্শনিক "অস্কার ওয়াইল্ড", কারণ তিনি তার চেয়েও আরও বেশি কলঙ্কজনক এবং প্রশান্তমনা। কত মর্মান্তিক আঘাত থেকে শলঝেনিৎসিন তার বক্তব্য জানিয়েছিলেন তা আরও পরিষ্কার, রুশ শাসকরা যেভাবে অ্যালেক্সি নাভালনিকে প্রথমে বিষ প্রয়োগ, পরে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসার পর সম্প্রতি তাকে জেলের ভিতরে নিখুঁত দক্ষতায় হত্যা করার ঘটনা থেকে।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমকক্ষ চিন্তাবিদ, কবি, সাহিত্যিক দার্শনিক সমগ্র বিশ্বে বিরল, অপ্রতিদ্বন্দী। কার্ল মার্ক্সের জন্ম জার্মানিতে, ফিলসফি তথা দর্শন নিয়ে তার স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং হেগেলীয় রাজনৈতিক মতবাদের অনুরক্ত একনিষ্ঠ ভক্ত। বাধ্য হয়ে দেশান্তর ও ইংল্যান্ডে আশ্রয়, ধনী বন্ধু এঙ্গেলের বদান্যতায়। আমৃত্যু প্রবাসী সেখানেই। 'বিবিসি'ও ইংল্যান্ডের। জন্মভূমি সেই জার্মানিতেই উনিশশো তের সালে এক তের বছরের কিশোরী রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রশ্ন রাখে— 'কে আপনার মননে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি?'

রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ দ্বিধাহীন উত্তর দিয়েছিলেন— প্রকৃতি সর্বোত্তম শব্দকে ঘৃণ্য করে (হেট কথাটি প্রয়োগ করেন)। আমরা নিশ্চিত হতে পারি কে শ্রেষ্ঠ, কে মহান কিন্তু কে সর্বশ্রেষ্ঠ তা স্থির করতে পারি না। সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বোত্তম বাছাই করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে প্রকৃতিকে বিচারকের ভূমিকায় বসিয়েছেন তা তর্কাতীত। অভূতপূর্ব তাঁর দার্শনিক চিন্তার যথার্থতা। বিবিসি-র ক্ষয়িষ্ণু গ্রহণযোগ্যতাকে চাঙ্গা করতে গিয়ে কৌশলে কে 'সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ' প্রশ্নটি আরোপ করে জনমানসে প্রোথিত করতে চেয়েছে বিবিসি, তা একদিকে যেমন দুর্বল তেমনই ন্যক্কারজনক এই নির্বাচন। তাই বিবিসি-র নির্বাচন নিয়ে আপ্লুত হয়ে আবেগ প্রদর্শনের অবকাশ নেই। সে নির্বাচনের সমর্থন করাও বালসুলভ আচরণের সামিল।

লেখক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

e-mail: ranojitpal2013@gmail.com • M. 9831717737

সি দ্ধা র্থ জো য়া র দা র

বিজ্ঞানমনস্ক মানবতাবাদী ধর্মের প্রসারে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে

পড়শি দেশের ধর্মীয় মৌলবাদের দাপাদাপি ও মানবতা-বিরোধী কার্যকলাপের প্রেক্ষিতে ভারতীয় সমাজেও তৈরি হয়েছে এক অনাবশ্যক অস্থিরতা ও সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাসের বাতাবরণ। এটা প্রমাণ করছে, আমরা মানসিকভাবে এখনও কতটা অপরিণত এবং ধর্মীয় ভাবাবেগে সম্পৃক্ত। এর প্রেক্ষিতে আমরা কি বিকল্প ভাবনাকে আশ্রয় করতে পারি না? সময় এসেছে, মুখ ঘুরিয়ে না থেকে বিষয়টাকে নিয়ে গভীরভাবে ভাবার।

বিজ্ঞানের হাত ধরেই সভ্যতার অগ্রগতি হয়েছে। পাথরকুচি ঘষে আগুন জ্বালানো যদি শুরু হয়, তবে চাকা আবিষ্কারকে ধরতে হবে অগ্রগতির অন্যতম ধাপ। প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কৃষি ও শিল্পে আমাদের অনেক উন্নতি হয়েছে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের জোগাড় হয়েছে। বাঁচার ও সুস্থ থাকার জন্য আমরা পেয়েছি প্রয়োজনীয় ওষুধ ও পরিষেবা। পেয়েছি মনোরঞ্জন ও স্বাচ্ছন্দ্যের সমস্তরকম উপকরণ। মোটের উপর আমাদের ভরণপোষণের সমস্তটাই হচ্ছে বিজ্ঞান তথা প্রযুক্তির কল্যাণে।

একটু ভেবে দেখুন, বিজ্ঞানকে কম সময়েই আমরা হৃদয় দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করি। উপর উপর কেউ ভাবি বিজ্ঞান হল নিরূপিত সত্য, কেউ ভাবি এটি হল বিশেষ জ্ঞান। আবার কেউ মনে করি, এটি বিষদে জানা অর্থাৎ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফলে ক্রমানুসারে লব্ধ জ্ঞান। অথচ বিজ্ঞানের যুক্তিবাদী দর্শন আমাদের কাছে ধরা পড়ে না।

বিজ্ঞানের স্বরূপ কিন্তু নিউটনের গতিসূত্র, a প্লাস b হোল স্কোয়্যারের ফর্মূলা অথবা জীবকোশের গঠন নয়। বিজ্ঞানের স্বরূপ হল যুক্তিবাদী চিন্তা, সংস্কারমুক্ত চেতনা ও অনুসন্ধিৎসু মনন। বিজ্ঞানের স্বরূপকে সঠিকভাবে জানা এবং তাকে নিজের মননে স্থায়ীভাবে জায়গা করে দেওয়াই হল বিজ্ঞানমনস্কতা। এ যেন নিজের জীবনযাত্রাকে সত্যের সঙ্গে বিলীন করে পরমসত্যের দিকে যাত্রা করার প্রয়াস।

বিজ্ঞানকে হৃদয় দিয়ে বুঝতে হবে। বিজ্ঞান মানুষকে প্রশ্ন করতে শেখায়, যুক্তি দিয়ে কোনও পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করতে শেখায়। বিজ্ঞান আমাদের শারীরিক ও মানসিক গঠন জানতে শেখায়, আমাদের চিন্তা ও চেতনার পরিসরকে বিস্তৃত করে এবং মুক্তমনা ও প্রগতিশীল হতে শেখায়। ফলত মানুষ হয়ে ওঠে একজন বিজ্ঞানমনস্ক, মানবতাবাদী উন্নত মানুষ।

যুক্তি ও বিবেক একজন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষকে জীবনে চলার পথে সমস্তরকম দুঃখ ও হতাশাকে জয় করতে শেখায়। আবেগতাড়িত না হয়ে শান্ত ও অবিচল হতে শেখায়। ঘোর প্রতিকূল সময়ে নিয়তি বা ভাগ্যের উপর দোষারোপ না করে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে শেখায়। পলায়ন মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পরামর্শ দেয়। বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ তাই স্বনির্ভর ও মানসিকভবে বলিষ্ঠ। এই ধরনের মানুষ সংস্কারমুক্ত বলে তাকে ধারণের সামগ্রী (আংটি, মাদুলি, তাবিজ ইত্যাদি) কিনতে হয় না। পয়সা বাঁচে। গুনিন ওঝার পাল্লায় পড়ে প্রাণ-সংশয়ের সমস্যায় পড়তে হয় না। দিনক্ষণ মেনে অধিষ্ট কাজ করতে হয় না বলে তার কাছে সময়ের ব্যাপারে আড়ষ্টতা থাকে না। হাতে পর্যাপ্ত সময় থাকায় সময়ের সঠিক ব্যবহার করা যায়।

বিজ্ঞানমনস্ক মানুষকে অনেকেই দাম্ভিক, উন্নাসিক ও উচ্ছৃঙ্খল মনে করেন। কেউ মনে করেন, তারা শ্রদ্ধা-ভক্তিরহিত পাষণ্ড; মায়া-মমতা-ভালোবাসাহীন নির্দয় ও নিষ্ঠুর ব্যক্তি। অথচ বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী ও মুক্তমণা মানুষরা যে একদমই এরকম হন না, বরঞ্চ উল্টো প্রকৃতির হন, সেটা তো আমরা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, ডিরোজিও, হলডেন, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সত্যজিৎ রায়-এর মত মনীষী ও বিশিষ্ট মানুষের জীবনী থেকেই প্রমাণ পেয়েছি।

আসলে বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ ভাবাবেগ ও যুক্তির মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে চলতে পারেন বলেই স্নেহ, মমতা, প্রেম, শ্রদ্ধা ও ভক্তির মতো মানুষের মধ্যেকার সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোয় তার মধ্যে কোনও ভাবেই ঘাটতি দেখা যায় না। যুক্তিবাদী মানুষ প্রকৃতই কর্তব্যপরায়ণ, চরিত্রবান এবং নীতিনিষ্ঠ। বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের চারিত্রিক গুণগুলো প্রতিটি মানুষকে একে অপরের সঙ্গে হৃদয়ের বন্ধনে বাঁধতে সাহায্য করে, তৈরি হয় মানবধর্ম। আজকের পৃথিবীতে এই মানবধর্মের প্রচার ও প্রসার একান্তভাবে জরুরি হয়ে পড়েছে।

সমাজকে রক্ষা করতে হলে, সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায় তথা সমস্ত জাতের ও বর্ণের মানুষকে নিজস্ব ধ্যান-ধারণার আবদ্ধভূমি থেকে বেরতে হবে। নিজেকে বৃহৎ মানব সম্প্রদায়ের অংশ মনে করতে হবে, যেখানে যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানমনস্কতার ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে মানবতাবাদ তার ধ্বজা তুলে ধরেছে।

আমাদের সংবিধানের ৫১এ ধারার এইচ উপধারায় পরিষ্কার বলা আছে, "সায়েন্টিফিক টেম্পারামেন্ট" অর্থাৎ বিজ্ঞানের মেজাজ তৈরি হল আমাদের প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য। আমরা এটা কয়জন জানি, আলোচনা করি বা মেনে চলি? নাগরিক হিসাবে আমাদের কর্তব্য হওয়া উচিত জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান সচেতনতা প্রচার করা, বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসার ঘটানো এবং প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে বিজ্ঞানের মেজাজ তৈরিতে সচেষ্ট হওয়া।

স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা পড়ানো হলেও "জনপ্রিয় বিজ্ঞান" এবং বিজ্ঞানমনস্কতা তৈরির আলাদা কোনও বিষয়সূচি না থাকায় এর প্রাথমিক পাঠ স্কুলের শিশুদের দেওয়ার সুযোগ থাকে না। বিজ্ঞান শিক্ষকদের নিষ্ঠার উপরই নির্ভর করে শিশুমনে একদিকে যেমন বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির সাফল্য, অন্যদিকে বিজ্ঞানমনস্কতার বীজ রোপনের প্রয়াস।

ভারতবর্ষের মত বিবিধ ধর্ম-সম্প্রদায়, জাত, বর্ণ, ভাষা ও সংস্কৃতির দেশকে যদি এক জাতিসত্তা হিসাবে টিকে থাকতে হয়, তবে বিজ্ঞানমনস্ক মানবধর্মের কোনও বিকল্প নেই। পবিত্র এই কাজে "সমাজের কারিগর" শিক্ষকদের এগিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি জনজীবনে বিজ্ঞানমনস্কতা ও মানবপ্রেমের বাণী ছড়িয়ে দিতে আরও উদ্যোগী হতে হবে বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক গণসংগঠনগুলোকে। তাঁরাই পারবেন এই মহান কাজকে বাস্তব রূপ দিতে।

লেখক, পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো তথা বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

e-mail: joardar69@gmail.com • M. 9231533335

ভ বা নী প্র সা দ সা হু

জীবিত পুত্রিকা

নিছক কুসংস্কারের জন্য নিজের প্রিয় সন্তানকে 'হত্যা' করার মর্মান্তিক ঘটনাগুলো এখনো যেভাবে আমাদের চারপাশে হয়ে চলেছে, তাতে যেকোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সচেতন ব্যক্তিরই প্রবলভাবে বিচলিত হওয়ার কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের মধ্যে এমন বিচলিত হওয়ার মানুষের সংখ্যা কমই, বরং বেশির ভাগ মানুষই তাকে উৎসাহই দিয়ে যান।

আমাদের দেশে এখনো ঘটে চলা এধরনের নানা ঘটনার মধ্যে সম্প্রতি ঘটা একটির কথা এখানে বলা যায়। এই ২০২৪-এর সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মায়েরা তাঁদের জীবিত পুত্রের মঙ্গলের জন্য তিনদিনের 'জীবিত পুত্রিকা' বা 'জিতিয়া' নামে একটি ব্রত পালন করেছিলেন অন্যান্য বছরের মতই। ব্রতের শেষে সারাদিন উপোস করে সন্তানসহ মা জলে ডুব দেন। আর তা করতে গিয়ে এবার ৩৭টি শিশু সহ ৪৬ জনের মৃত্যু ঘটল।

কয়েকদিন আগেই হয়ে গেছে প্রবল বৃষ্টি। খাল, নদী, পুকুর, দীঘি—সবই জলে টইটুম্বুর। তার ওপর সারাদিন উপোস করে থাকা মা, সব মিলিয়ে সন্তান সহ ডুব দিতে গিয়ে এই মর্মান্তিক ঘটনা। কখনো শিশুটি জলের স্রোতে ভেসে গেছে বা হাত থেকে জলে পড়ে গেছে। মা ঝাঁপিয়ে পড়েও তাকে তুলতে পারেনি, কখনো বা ঝাঁপিয়ে পড়ে দুজনেই মারা গেছে। বিহারের পূর্ব ও পশ্চিম চম্পারণ, নালন্দা, ঔরঙ্গাবাদ, কাইমুর, বক্সার, সিওয়ান, বোহতাম, সারণ, পাটনা, বৈশালী, মুজফ্‌ফরপুর, সমস্তিপুর, গোপালগঞ্জ ও আরওয়াল জেলায় এইসব মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। সবচেয়ে বেশি ঘটেছে ঔরঙ্গাবাদে সেখানে ৮টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে স্পষ্টতই বিহারের একটি বিস্তীর্ণ এলাকায় এই 'জিতিয়া' পরব করেন হাজার হাজার মা, সরকারিভাবে কয়েকটি নদী ও পুকুরঘাট-এর জন্য চিহ্নিত করা হলেও ভিড়ের কারণে স্পষ্টতই সেগুলির বাইরেও বহু মা সন্তানসহ গেছিলেন।

আর ঘটনা ঘটার পর ঐ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মৃতদের পরিবার পিছু চার লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ? নাকি মৃত্যুর পুরস্কার? অথচ এই ধরনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রথাকে বন্ধ করার জন্য কোন জোরালো বার্তা দেওয়া দূরে থাক, প্রচ্ছন্নভাবে তাকে উৎসাহিতই করা হল, সঙ্গে নিরাপদ পুকুর বা ঘাটের ব্যবস্থাও করা হবে।

কিন্তু এইভাবে বাচ্চাকে বিশেষ একটি সময়ে জলে ডোবালে আলাদাভাবে তার তথাকথিত 'শুভ' বা 'মঙ্গল' যে হয় না কিংবা সে নীরোগ থাকে না— এটি সাধারণ বুদ্ধিতে একটু বিচার করলেই বোঝা যায়। অথচ একটি মিথ্যায় অন্ধবিশ্বাসের পরিণতি এমনই যে, নির্দ্বিধায় তা করা হয়। এক সময় এমনও বিশ্বাস ছিল যে, দীর্ঘদিন সন্তানের জন্ম না দিতে পারা মা মানত করতেন পরে সন্তান হলে প্রথমটিকে গঙ্গায় বা নদীতে বিসর্জন দেবেন, যাতে পরে আরো সন্তান হয়, গাছের প্রথম ফল দেবতাকে উৎসর্গ করার বিশ্বাসের মত। তা করা হতও। ইংরেজ আমলেই তা আইনত নিষিদ্ধ করা হয়। আবার অসুস্থ সন্তানদেরও গঙ্গায় ফেলে দিয়ে বিশ্বাস করা হত মা গঙ্গা নীরোগ সুস্থ সুন্দর সন্তান ফেরত দেবেন। এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ ও মর্মস্পর্শী কবিতা আছে— 'বিসর্জন'। সন্তানকে নদীতে বিসর্জন দিয়ে চোখ বন্ধ করে দু-হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকুল মা। ভাবছে এইবার দেবী কোলে করে ফেরত দেবে শিশুকে। কিন্তু অপেক্ষা আর মায়ের হাহাকারই সার।

মূলত এধরনের বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে দরিদ্র, অসহায়, শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত নারীদের মধ্যে। একটি সুস্থ শিশুর জন্য প্রয়োজন মায়ের অপুষ্টি মুক্ত সুস্থ শরীর ও গর্ভাবস্থায় উপযুক্ত খাদ্য ও সতর্কতা, সন্তানের ছয় মাস বয়স পর্যন্ত পর্যাপ্ত স্তন্যদুগ্ধ, রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকাকরণ, আলো বাতাস যুক্ত সুস্থ পরিবেশে থাকা ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসম্মত নিয়ম মেনে চলা, শিশুর কোন ধরনের অসুস্থতায় দ্রুত সঠিক চিকিৎসা ইত্যাদি। কিন্তু আগে তো বটেই, এখনো আমাদের দেশের বিপুল সংখ্যক পরিবারে এসব দুষ্প্রাপ্য। সরকারি টিকাকরণের উপর বিপুলভাবে জোর দেওয়ার কারণে, সংশ্লিষ্ট রোগগুলির প্রকোপ কিছুটা কমলেও অপুষ্টি, অর্ধাহার, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস ইত্যাদি যথেষ্টই আছে। এখনো ভারতের অন্তত ২০ কোটি মানুষ একবেলা কোনরকমে কিছুটা খেয়ে বাকি দিন অনাহারে কাটান বা কি খাবেন তার নিশ্চয়তা নেই। এই অবস্থায় সন্তানের মঙ্গলের জন্য 'জীবিত পুত্রিকা' বা 'জিতিয়া'-র মত বিপজ্জনক কুসংস্কারে আশ্রয় নেওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি হতেই থাকে। ঘটতে থাকে ঐ ধরনের মর্মান্তিক শিশুমৃত্যু।

মুস্কিল হচ্ছে সরকারিভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে দেশের আপামরজনসাধারণকে মুক্ত করার আন্তরিক, নিরবচ্ছিন্ন, কার্যকরী উদ্যোগের চেয়ে দরিদ্র মানুষদের ঐ ধরনের কুসংস্কারে ডুবিয়ে রাখতেই আগ্রহ বেশি। হয়ত দোহাই দেওয়া হয় ঐতিহ্য বা ধর্মবিশ্বাসে আঘাত না করার হাস্যকর যুক্তির। কিন্তু যা ক্ষতিকর, অকার্যকরী, প্রাণঘাতী তাকে ঐতিহ্য বা ধর্মের নামে টিকিয়ে রাখার কোন ধরনের চেষ্টা বা তার বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা না নেওয়াটা অমার্জনীয় অপরাধ— তা সে ডাইনি হত্যা বা তান্ত্রিক মতে শিশুবলি-নরবলি দেওয়াই হোক, গোমাংস খাওয়া বা রাখার জন্য কাউকে পিটিয়ে মারা কিংবা 'দলিত' শিশু খাওয়ার জলের পাত্র ছুঁয়ে ফেলে তাকে শাস্তি দেওয়াই হোক। এবং এধরনের অজস্র বীভৎসতা আমাদের দেশে (আরো কিছু দেশেও) ভয়ংকর ভাবে বর্তমান।

জীবিত পুত্রিকা বা 'জিতিয়া'-র পরে সরকারিভাবে কয়েক লক্ষ টাকা ধরিয়ে দিয়ে মুখ বন্ধ রাখা তথা মূল সমস্যা সম্পর্কে সচেতন না হতে পারাটাকেই ইন্ধন দেওয়া হচ্ছে। আরেকটু 'নিরাপদভাবে' যাতে 'জিতিয়া' উৎসব করা যায়, তার জন্য নিরাপদ পুকুরঘাট বা নদীর ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। কিন্তু তাকে বেআইনি ঘোষণা করার বা অন্তত তার অসারতা সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যাপক প্রচার করার সামান্যতম উদ্যোগও অনুপস্থিত। অথচ সরকারি কোন কাজকর্ম বা নেতানেত্রীর প্রচার করার জন্য বিপুল অর্থ, উদ্যোগ আর সময় ব্যয় করার ক্ষেত্রে কোনো কার্পণ্য থাকে না।

লেখক চিকিৎসক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

M. 8777598939

প্র বী র ব সু

ম্যানগ্রোভ অরণ্য কি সুন্দরবনের রক্ষাকর্তা?

ম্যানগ্রোভ অরণ্য সুন্দরবনের রক্ষাকর্তা। একসময় ম্যানগ্রোভ অরণ্য বিস্তৃত ছিল কলকাতা পর্যন্ত। সত্যিই বিস্ময়কর। ম্যানগ্রোভ মিষ্টি জল এবং লবণাক্ত জলেও বেঁচে থাকে। নানাভাবে এই গাছ অভিযোজন করে প্রকৃতিতে টিঁকে থাকে। ঝড় প্রতিরোধ করে আবার পলি ধরে রেখে দ্বীপগুলিকে বাঁচায়। বাঘ, কুমির, কাঁকড়া, শামুখ আরও পশু পাখির নিশ্চিন্ত আশ্রয়। সুন্দরবনে প্রায় মোটামুটি পঁচিশটি প্রকৃত ম্যানগ্রোভ স্পিসিস আছে আর পৃথিবীতে আছে মোট ৬০ টির মত। ম্যানগ্রোভের সঙ্গে দ্বীপের উচ্চতা বা নোনাজলে ডুবে থাকার সময় ছাড়াও মাটিতে লবণের পরিমাণের সম্পর্ক আছে। যেমন সুন্দরী, চাক কেওড়া, গোলপাতা এরা কম লবণতায় জন্মায়। আবার অতি লবণতা সহ্য করতে পারে কিছু গাছ যেমন কাঁকড়া, বাইন, গড়ান। কাজেই গোটা সুন্দরবন জুড়েই লবণতার মাত্রা অনুযায়ী পূর্ব-পশ্চিম বা উত্তর-দক্ষিণে ম্যানগ্রোভের কয়েকটি বিন্যাস আছে। এই বদ্বীপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সুন্দরবনের ভারতীয় অংশে এখন মিষ্টি জলের যোগান নেই। যেমন হুগলি নদী সুন্দরবনের পশ্চিমদিক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সুন্দরবনের ভেতরে ঢুকছে না। এখানে জলের লবণতা প্রায় তিরিশ। বাঘেরাও এখানে লবণাক্ত জল খেতে বাধ্য হয়। বর্ষায় লবণতা খানিকটা কমে। অন্যদিকে ইছামতীও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। মাতলাও তাই। বাংলাদেশের সুন্দরবনে জলের পরিমাণ বেশি। ফলে গাছগুলিও বিরাট এবং বড় বড়। কুড়ি ফুট, তিরিশ ফুট লম্বা লম্বা সব গাছ। সুন্দরী গাছ আছে গাদা গাদা। আমাদের সেই তুলনায় কিছুই নেই, সব বেঁটে বেঁটে, সরু সরু গাছ। ম্যানগ্রোভের স্বাস্থ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে অরণ্য ক্রমাগত কমে যাচ্ছে। লবণতার জন্য এদের বৃদ্ধিও কমে যাচ্ছে। আসলে ম্যানগ্রোভের জল, লবণতা, ভূমি এসবই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সুন্দরবনের জলবায়ু পরিবর্তন, সমুদ্রজলের বৃদ্ধি, ভূমি ব্যবহার, পলি সঞ্চয়ের হার ও জমির অবনমন নিয়ে বিভিন্ন ভাবে আলোচনায় ম্যানগ্রোভকে বাঁচানোর কোনো ব্যবস্থা নিতে না পারলে ২১০০ সালের মধ্যে সুন্দরবন অরণ্যের ৫৫ শতাংশ জলের তলায় চলে যাবে।

ম্যানগ্রোভের কাছ থেকে আমাদের চাহিদা প্রচুর। ম্যানগ্রোভ লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে তাকে রক্ষা করাও অত্যন্ত জরুরী। কোন্ ম্যানগ্রোভ লাগাবো? কোথায় লাগাবো? শুধু লবণতাই যে তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে তা নয়।

সমুদ্রের জল বাড়া-কমা কিন্তু বিশ্বব্যাপী ঘটনা, চাঁদ সূর্যের টান, পৃথিবীর আবর্তন নানা কারণ রয়েছে। ঋতু অনুযায়ী সমুদ্র জলতল, জোয়ার-ভাটার কমা-বাড়া হয়। পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্বে ঘোরে বলে পূর্ব উপকূলে সমুদ্রতলের উচ্চতা বেশি।

সুন্দরবন বদ্বীপের সবচেয়ে দুর্যোগ প্রবণ অঞ্চল হল আমাদের ভারতীয় অংশ কারণ সুন্দরবনের ভারতীয় অংশ হল পরিত্যক্ত বদ্বীপ। কারণ নদীর মূল স্রোততো আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। ভাগ্য ভাল যে একটা ফিডার ক্যানেল করে হুগলি নদীতে জল ঢোকানো গেছে, নইলে টালার জল পর্যন্ত লবণাক্ত হয়ে যেত। আমরা শুখা মরশুমে গঙ্গার মধ্যে তিরিশ হাজার কিউসেকও জল পাই না কিন্তু পাওয়ার কথা ৪০ হাজার কিউসেক। আমরা ভারতের একটা ছোট্ট অংশ কিন্তু আমরা তো ভারতের মধ্যে প্রবাহিত গঙ্গানদীর একেবারে শেষে আছি। আমরা তো আমাদের প্রাপ্য জলটুকুও পাচ্ছি না।

তাছাড়া বর্তমান অবস্থায় ম্যানগ্রোভ অরণ্যভূমির দায় রোধ করতে পারছে না। ম্যানগ্রোভের শিকড় দিয়ে মাটি ধরে রাখে। দিনের পর দিন মাটি ধরে রাখতে গেলে তো মাটি লাগবে। তার জন্য দরকার নিয়মিত পলি জমা হওয়া কিন্তু আমাদের তো নদীই নেই যে পলি বহন করে আনবে। আর যে একমাত্র নদী গঙ্গা বা হুগলি নদী সুন্দরবন পর্যন্ত প্রবাহিত হচ্ছে সেটার পলিতো জমা হচ্ছে ফারাক্কায়। হ্যাঁ, জল আমরা পাচ্ছি কিন্তু সেডিমেন্ট তো পাচ্ছি না। তার ফলে মিষ্টি জল নেই বলে ম্যানগ্রোভগুলো কুঁকড়ে ছোট হয়ে যাচ্ছে। আর পলি নেই বলে বদ্বীপটা সমুদ্রের দিকে আর বাড়ছে না। বরং ছোট হয়ে যাচ্ছে। আর পলি নেই বলে বদ্বীপটা সমুদ্রের দিকে আর বাড়ছে না। বরং ছোট হয়ে যাচ্ছে। ম্যানগ্রোভ সেই ক্ষয় আটকাতে পারছে না। তার সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে একের পর এক সাইক্লোন আসছে। যেখানে ম্যানগ্রোভগুলো ভেঙ্গে যাচ্ছে, চেষ্টা করছে লড়তে। কিন্তু ৫/৬ বছরের মধ্যে সে যে আবার শক্তি সঞ্চয় করে দাঁড়াবে, সেই সময়টুকু পাচ্ছে না। এখনতো পরপর বুলবুল, আর ফণি, ইয়াস, সিত্রাং একের পর এক আঘাত করছে। একদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঘূর্ণিঝড়ের প্রবণতা বাড়ছে। অন্যদিকে বদ্বীপে মিষ্টি জল নেই, পলির যোগান নেই তাহলে ম্যানগ্রোভ লড়বে কি করে?

বর্তমানে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বন্যা উপদ্রুত অঞ্চলে কংক্রিটের বাঁধের জন্য প্রায়ই মিছিল, মিটিং প্ল্যাকার্ড সহ মানুষের অবরোধ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু সুন্দরবনের ২৫০০ কিমি নদীবাঁধের কংক্রিট বাঁধের ব্যবস্থা করে বাস্তবে অসম্ভব। কারণ যেখানে দুর্বল নদীবাঁধের স্থানগুলিতে কোথাও এক ঝুড়ি মাটি পর্যন্ত পড়ে না।

সুন্দরবনের নোনা জলের তীব্র চোরাস্রোত, তাছাড়া নোনা জলের ঢেউ-এর ধাক্কা— এক মুহূর্তে কংক্রিটের বাঁধ ধ্বসিয়ে দিতে পারে। তাছাড়া নদী বাঁধের আলগা মাটির কংক্রিট ধরে রাখা অসম্ভব। যে চোরাস্রোতে নদীবাঁধ ভাঙ্গতে শুরু করেছে, সেখানে কংক্রিটের দেওয়ালের রক্ষা করার ক্ষমতা নেই কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে ২০০৬-এর জুনে ভরা কোটালে যেখানে ম্যানগ্রোভ নেই এমন ৬৬টি জায়গায় ভেঙ্গেছিল কিন্তু যে সমস্ত নদীবাঁধের পাশে কুড়ি ফুট চওড়া ম্যানগ্রোভের দেওয়াল ছিল সেই জায়গায় বাঁধ ভাঙ্গতে পারেনি। ১৯৯৯-এর নভেম্বরে উড়িষ্যার নদীভাঙ্গার মূল কারণ ছিল ম্যানগ্রোভ ধ্বংস।

অতি সম্প্রতি ভিতরকণিকা ন্যাশনাল পার্কের দিকে বাইরে ধামরা অঞ্চলে যে ব্যাপক সাইক্লোন 'দানা' এসে দেখিয়ে গেল যে ম্যানগ্রোভ মানুষের কত বড় বন্ধু। দানাকে বশ মানিয়ে তোলার ১২০ কিমি গতিবেগের সাইক্লোনকে দুর্বল করে তোলার ক্ষেত্রে ম্যানগ্রোভের ভূমিকা অপরিসীম। এবার দানা স্পষ্ট দেখাল ম্যানগ্রোভ আছে বলেই উপদ্রুত মানুষ এখনও অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারছে। কাজেই ম্যানগ্রোভের গুরুত্ব বিষয়ে উপদ্রুত অঞ্চলের স্থানীয় মানুষ এবং পর্যটকদের সরকারের তরফ থেকে আরও বেশি করে সচেতন করা অত্যন্ত জরুরী।

লেখক জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশকর্মী এবং বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

M. 9830676330

সৌমেন বিশ্বাস

মুক্ত হোক নদী

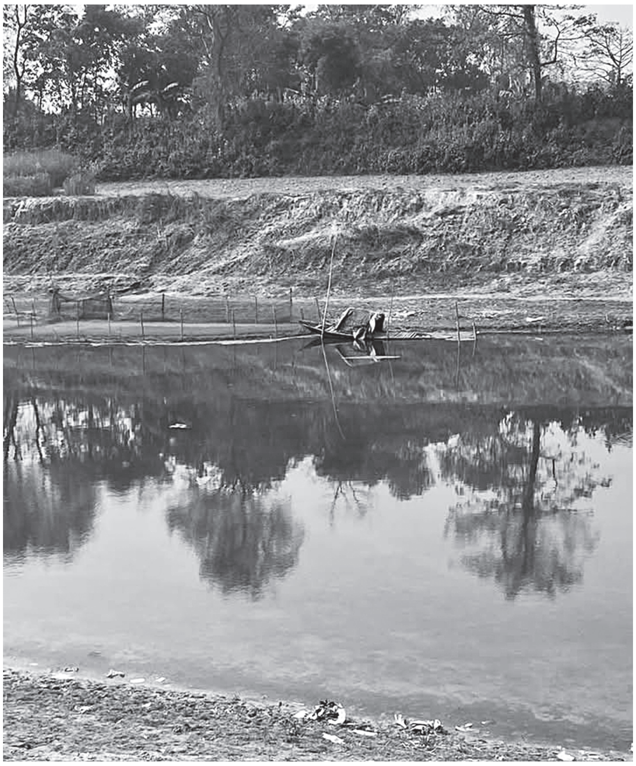

হরিহরপাড়ার স্বরূপপুরে ফেরিঘাটে দুই পাড়ে নদীর বুকে মাটির জেটি তৈরি করা হয়েছে, ডাঙা থেকে জলাভাগের মধ্যে (ছবি : মফিদুল ইসলাম, প্রকাশিত আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)। দুই পাড় থেকে প্রায় দশ ফুট করে মাটির ঢিবি (রাস্তা) জলার এক-চতুর্থাংশ দখল করেছে। রানিনগর আর রানিতলা থানার মাঝে হরিরামপুর ফেরিঘাটে ভৈরবের বুকে ১৪৫ মিটার লম্বা কংক্রিটের ঢালাই রাস্তা তৈরি করেছে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ। (আঃবাঃপঃ মুর্শিদাবাদ সংস্করণ, ৬ জুলাই ২০২৪)। স্থানীয় মানুষের দাবী সেতুর। পরিবর্তে নদীতলে (River Bed) কংক্রিটের ঢালাই রাস্তা দিয়ে ভৈরব নদীর দু-কূল জুড়ে দিয়েছে। নদী দখলদারীর অভিনব ইতিহাস! ভৈরবের বুকে বাঁশের বেড়া (আঃবাঃপঃ ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৪, মুর্শিদাবাদ সংস্করণ)। ইসলামপুরের ভৈরব সেতুর অনতিদূরে ভৈরব নদের মাঝ বরাবর দখল হয়ে গিয়েছে এবং হচ্ছে। প্রথমে ভৈরবের বুকে গাছ লাগানো হচ্ছে। তারপর বাঁশের বেড়া দিয়ে জবর দখল। গাছের গোড়ায় মাটি দেওয়ার নামে ক্রমশ উঁচু হচ্ছে মাটির স্তূপ।

নদীর বুকে অবৈধ ভাবে ঢালাই রাস্তা (আঃবাঃপঃ, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৪, ছবি : সাগর হালদার)। জলঙ্গী নদীর উপর নদীয়ার রঘুনাথপুর ঈশ্বরচন্দ্রপুর ফেরিঘাটে জেলা পরিষদের উদ্যোগে সিমেন্টের ঢালাই রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। রঘুনাথপুর থেকে ফেরিঘাটে যাওয়ার মূল রাস্তা মাটির, কিন্তু মূল রাস্তা থেকে দক্ষিণদিকে ১০০ ফুট ঢালাই রাস্তার ১৫ ফুট নদীবক্ষে তৈরি হয়েছে, জলাভাগের মধ্যে। জলাভাগের বাকি অংশ বাঁশের তৈরি সেতু জলঙ্গির অপর (দক্ষিণ) পাড়ের সাথে যুক্ত হয়েছে। ভৈরব নদের ছায়া জলঙ্গি নদীতেও।

ভৈরব নদের প্রকৃত উৎপত্তি পদ্মা নদী থেকে, হাসানপুর গ্রামের দক্ষিণে চর হাসানপুর থেকে। উৎপত্তিস্থল থেকে পূর্বদিকে পদ্মানদীর সামান্তরাল পদ্মার দক্ষিণ দিকের প্লাবনভূমির চর দেবাইপুর হয়ে চর মোল্লাডাঙ্গা থেকে দক্ষিণ দিকে পবাহিত হয়েছে। হাসানপুর থেকে মোল্লাডাঙ্গা পর্যন্ত ভৈরব নদের গতিপথ প্লাবনভূমিতে হওয়ায় বন্যার সময় ভৈরব নদের প্রকৃত নির্গমন/উৎস স্থল মোল্লাডাঙ্গা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। স্থানীয়দের কাছে ছোটা ভৈরব নামেও পরিচিত।

ভৈরবের গতিপথ মোল্লাডাঙ্গা থেকে ইসলামপুর হয়ে ভগীরথপুর, জিৎপুর, পাটিদিয়াড় জিৎপুরের পর নদীয়া জেলার রাধানগর হয়ে পলাশীপাড়া দিয়ে রঘুনাথপুরের পাশ হয়ে চাপড়া, তেহট্ট, হাঁসখালি, দইয়ের বাজার, কৃষ্ণনগরের পর নবদ্বীপে ভৈরব/জলঙ্গী ভাগীরথী-হুগলি নদীতে মিশেছে। বর্তমানে ভারতীয় ভৈরবের মূল জলধারাই নবদ্বীপ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। জলঙ্গী নদী আসলে এখন জলঙ্গী নয়, ভৈরবের ধারা প্রবাহ। বাংলাদেশের সুবলপুরে মাথাভাঙ্গা নদী থেকে আন্তর্জাতিক ভৈরব নদের উৎপত্তি। এই ভৈরব বাংলাদেশের মধুগাড়ী, কাথলী, সাহেবপুর থেকে ভারতের কুটিরপাড়া, ব্যাসপুর ঢুকে কাঁঠালিয়া, পুরাতন চর, পাটাবুকা হয়ে করিমপুর শ্মশানের কাছে, উত্তর দিক থেকে আগত, জলঙ্গী ঘোষপাড়ায় পদ্মানদী থেকে উদ্ভূত জলঙ্গী নদী ভৈরব (আন্তঃ) নদীর সাথে মিশে জলঙ্গী নামে প্রবাহিত হতো। প্রকৃত জলঙ্গী নদীর উৎসমুখ পদ্মানদী থেকে মুর্শিদাবাদের রাইপাড়া চর, জলঙ্গী-ঘোষপাড়ায়। সেখান থেকে সাদিখান দিয়াড়, সাহেবরামপুর, কুপিলা, নিশ্চিন্তপুর -গড়াইমারী হয়ে করিমপুর শ্মশানঘাটে মিশেছে। সেখান থেকে বৈষ্ণব পাড়া, আমিনাবাদ, অম্বরপুর, মধুরকূল, কুশাবাড়িয়া হয়ে নদীয়ার থানারপাড়া থানার মুক্তারপুর গ্রামে জলঙ্গী (আন্তর্জাতিক ভৈরব) নদ, ভারতীয় ভৈরব নদের (মোল্লাডাঙ্গা-ইসলামপুর ইত্যাদি) সাথে মিশেছে। সংযুক্ত পরবর্তী নদীপথ মায়াপুরের হুগলী-ভাগীরথী পর্যন্ত জলঙ্গী নদী নামে অবহিত।

বর্তমান অবস্থায় (২০২৫ সাল) জলঙ্গী নদী অস্তিত্বহীন। আন্তর্জাতিক ভৈরব নদীটি করিমপুর শ্মশানঘাট থেকে উত্তর, দক্ষিণ দুটি ধারায় ভাগ হয়েছে।উত্তরের ধারাটি উত্তর দিকে গিয়ে গড়াইমারীর নিশ্চিন্তপুরে শেষ হয়েছে। দক্ষিণের ধারাটি বক্সিপুর ঘাট হয়ে ধোড়াদহের মোমিনপুর চরে শেষ হয়েছে। দক্ষিণের এই ধারাই আন্তর্জাতিক ভৈরব নদের মূল প্রবাহ ছিল। বর্তমানে আর বহমান নয়। উত্তরের গড়াইমারীর নিশ্চিন্তপুর থেকে দক্ষিণ দিকের মোমিনপুর পর্যন্ত লম্বা আবদ্ধ জলাশয় দামোস বা দহে পরিণত হয়েছে। জলঙ্গীর উৎসমুখ থেকে নিশ্চিন্তপুর, গড়াইমারী পর্যন্ত এবং দক্ষিণে মোমিনপুর থেকে জলঙ্গী ও ভৈরব নদের মিলনস্থল মোক্তারপুর পর্যন্ত জলহীন নদীর কঙ্কাল। ভরা বর্ষাতেও জলঙ্গী বহমান হয় না। বাংলাদেশের মধুগাড়ী থেকে ভারতের করিমপুরের মানিকতলা পর্যন্ত শীর্ণকায় ভৈরবের ক্ষীণ জলধারা জলঙ্গীকে জলপুষ্ট করতে পাবে . না। কারণ বাংলাদেশের মধুগাড়ীর পর থেকেই বাড়ি, দোকান-বাজার, জঞ্জালে নদী দখল হয়ে গিয়েছে বা যাচ্ছে। জলঙ্গী ঘোষপাড়া থেকে নিশ্চিন্তপুরের আবস্থা একই কারণে।

জলঙ্গীর নদীর এই হাল গত ১৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যে হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই মোমিনপুরের পরবর্তী অংশে মোক্তারপুর পর্যন্ত

বর্ষাতেও জলপ্রবাহ হয় না। আগামী ৫ থেকে ১০ বছরে অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার পথে। ভৈরব (ভারত) নদ কিন্তু এখন বেঁচে আছে। আগের মতো না হলেও বর্ষায় ভরা যৌবন ফিরে পায়।

জর্জিয়া আইন অনুসারে নদীপাড় সংলগ্ন জমি মালিকের। জলের অধিকার সর্বসাধারণের। ১৯০৫ সালের ভারতীয় আইনের তিন নম্বর অনুচ্ছেদের দুই নম্বর ধারা বলে জলপ্রবাহ বা নদী সরকারের। যদিও নদীর পাড় এবং তলদেশ ব্যক্তি মালিকাধীন। ভারতের সর্বোচ্চ আদালত ১৬ই ফেব্রুয়ারী'২০১৮ তারিখে উল্লেখ করেছে— নদীর জল জাতীয় সম্পদ। প্রকৃতির উপকারী উপহার। কেউ একচেটিয়া মালিকানা দাবী করতে পারবে না। অন্যান্যদের নদীর উপকার থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না।

সার্বিকভাবে নদী জলসম্পদ এবং পরিবেশ দপ্তরের অধীনে। যদি মৎস্যজীবীদের জন্যে উল্লেখযোগ্য হয়, তাহলে নদী মৎস্য এবং জলজ কৃষি পালন দপ্তরের অধীনে। নদী সেচ, পানীয় জল সরবরাহ অথবা জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের জন্যে ব্যবহার করা হলে নদী পূর্ত বিভাগের অধীনস্থ। নদী যদি বন বিভাগের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয় তাহলে বন বিভাগের তত্ত্বাবধানে থাকে। নদী সংরক্ষিত বন্য প্রাণীর বাসস্থান হলে নদী বন্যপ্রাণী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়। বাকীটা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, যেমন গ্রাম পঞ্চায়েত ইত্যাদি এবং যদি শহরাঞ্চলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হলে পৌরসভার দায়িত্বে থাকে।

নদীর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব, সমস্ত নাগরিকের সাংবিধানিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। সবটা রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর দায় চাপালে চলবে না। তবে রাস্ট্রনেতাদেরও সতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা রয়েছে। তাদের ব্যক্তিসত্তারও সামাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে। তিনিও নদীর সুবিধা, উপযোগিতাগুলির উপভোক্তা। পৃথিবী বিপন্ন হলে তাঁকেও সংকটের সম্মুখিন হতে হবে। তবে উদ্যোগ নিতে হবে স্থানীয় স্তর থেকে। আপনাদের সাথে আছে নদীযোদ্ধারা।

তথ্যসূত্র

১. আনন্দবাজার পত্রিকা-মুর্শিদাবাদ সংস্করণ ২১.০২.২০২৪,০৬.০৭.২০২৪, ৩১.১২.২০২৪, নদীয়া সংস্করণ ২৮.১২.২০২৫, নদীয়া-মুর্শিদাবাদ সংস্করণ ৩১.০৩.২০০৪।

২. ধীমান দাস, নদীযোদ্ধা, ভৈরব নদ ও জলাশয় রক্ষা পরিষদ।

৩. শংখ শুভ্র চক্রবরতী-নদী যোদ্ধা, জলঙ্গী নদী সমাজ।

৪. বিজয় বিশ্বাস, সাহেবরামপুর, জলঙ্গী।

৫. উর্জা, প্রথম বর্ষ, শীতকালীন (৩য়) সংখ্যা, মুক্ত হোক ভৈরব নদ। ছবি : ধীমান দাস।

লেখক মুর্শিদাবাদ জিলা বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য, বিজ্ঞান কর্মী ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক
e-mail: soumen.biswas.sbi.1961@gmail.com • M. 9734052868

জানা-অজানা

জয়শ্রী দত্ত

জানা অজানায় প্রজাপতি উদ্যান

রঙবাহারী মরসুমী ফুলের বাগানে রঙের আগুন ছড়িয়ে দেয় নানা রঙের প্রজাপতিগুলো। মরসুমী ফুলের বাগানের মত প্রজাপতি উদ্যানও (Butterfly garden) ইদানীংকালে প্রকৃতি প্রেমিকদের কাছে খুব আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় প্রজাপতিগুলো লেপিডোপটেরা (Lepidoptera) বর্গের অন্তর্গত। তাই প্রজাপতি উদ্যানকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় Lepidopterium বলে। এখানে শুধু প্রজাপতি নয়, দেখতে পাওয়া যায় ডিম, লার্ভা থেকে পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি মথ সবই। সেইসঙ্গে দেখা যাবে প্রজাপতিদের পছন্দমত গাছগুলোও। জীববৈচিত্র রক্ষার দিক থেকে প্রজাপতি উদ্যান খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রজাপতির জীবনচক্রে চারটে পর্যায় আছে। ডিম, শুককীট, মুককীট, পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি। জীবনচক্রের এই চারটি পর্যায়ের ভালভাবে বড় হওয়ার ওপরে নির্ভর করে প্রজাপতির সংখ্যা, প্রজাতি বা বিভিন্ন প্রজাতির অনুপাত।

পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতিরা সাধারণ ভাবে ফুলের মধু, ফলের রস, গাছের বাকলের রস এই সবই খায়। যে ফুলের মধু কোন প্রজাপতি খায় দেখা যায় ডিম পাড়া বা শুককীট অবস্থায় তারা অন্য গাছে অবস্থান করে। ফলে মুককীট হতে পারে অন্য গাছে। এই জন্যে প্রজাপতি উদ্যানে গাছ লাগানোর সময় স্থানীয় প্রজাপতিরা কোন ফুলের মধু খায়, কোন ফল বা বাকলের রস খায় সেটা জেনে নিতে হবে। সবার আগে জানতে হবে বিভিন্ন অঞ্চলে থাকা বিভিন্ন প্রজাপতির পরিচয়। প্রজাপতি উদ্যানের জমির ঢাল দক্ষিণের দিকে হলে ভাল হয়। সাধারণ ভাবে প্রজাপতিদের বলা হয় ectothermic প্রাণী। এরা এদের রেচনের (Metabolism) জন্য সূর্যকিরণের ওপর নির্ভরশীল। সূর্যের পূর্ব-পশ্চিমের উদয় অস্তের জন্য ঐদিকে মাটি তাড়াতাড়ি শুকোলে ঐদিকে প্রজাপতিগুলোর উড়ে বেড়ানোর সুবিধে হয়। ছোট বীরুৎশ্রেণির ফুলগাছগুলো মাটির কাছাকাছি থাকে। জমি শুকনো থাকলে প্রজাপতিদের ঐ গাছগুলোর ফুলের কাছে যেতে সুবিধে হবে। বাগানের চারদিকে ঝোড়ো হাওয়া আড়াল করার জন্য বড় গাছ লাগাতে হবে।

যে সব অঞ্চলে যে সব প্রজাতির প্রজাপতি থাকে ঐ সব অঞ্চলের বাগানে গাছপালা লাগানো হবে প্রজাপতিরা কোন কোন গাছ পছন্দ করে সেটা পর্যবেক্ষণ করে। আবার ঐ প্রজাপতিগুলো কোন গাছের পাতায় ডিম পাড়বে বা শুঁয়োপোকারা পাতা খাবে আর মুককীট তৈরি করবে সেটাও বিভিন্ন।

শীতের শুরু থেকে দেখা যাবে ছোট ছোট হাল্কা হলদেটে সব্জে রঙের প্রজাপতিগুলো উড়ে বেড়াচ্ছে নানা রঙের পুটুস ফুলের ওপরে। টাইগার মরমন ও আরো বেশ কয়েকটা প্রজাপতির ওড়াউড়ি, আর ফুলের মধু সংগ্রহ করতে দেখা যায়।

লেখক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক *M. 9831060548*

তরুণ রায় চৌধুরী

আরল সাগর বিপর্যয়

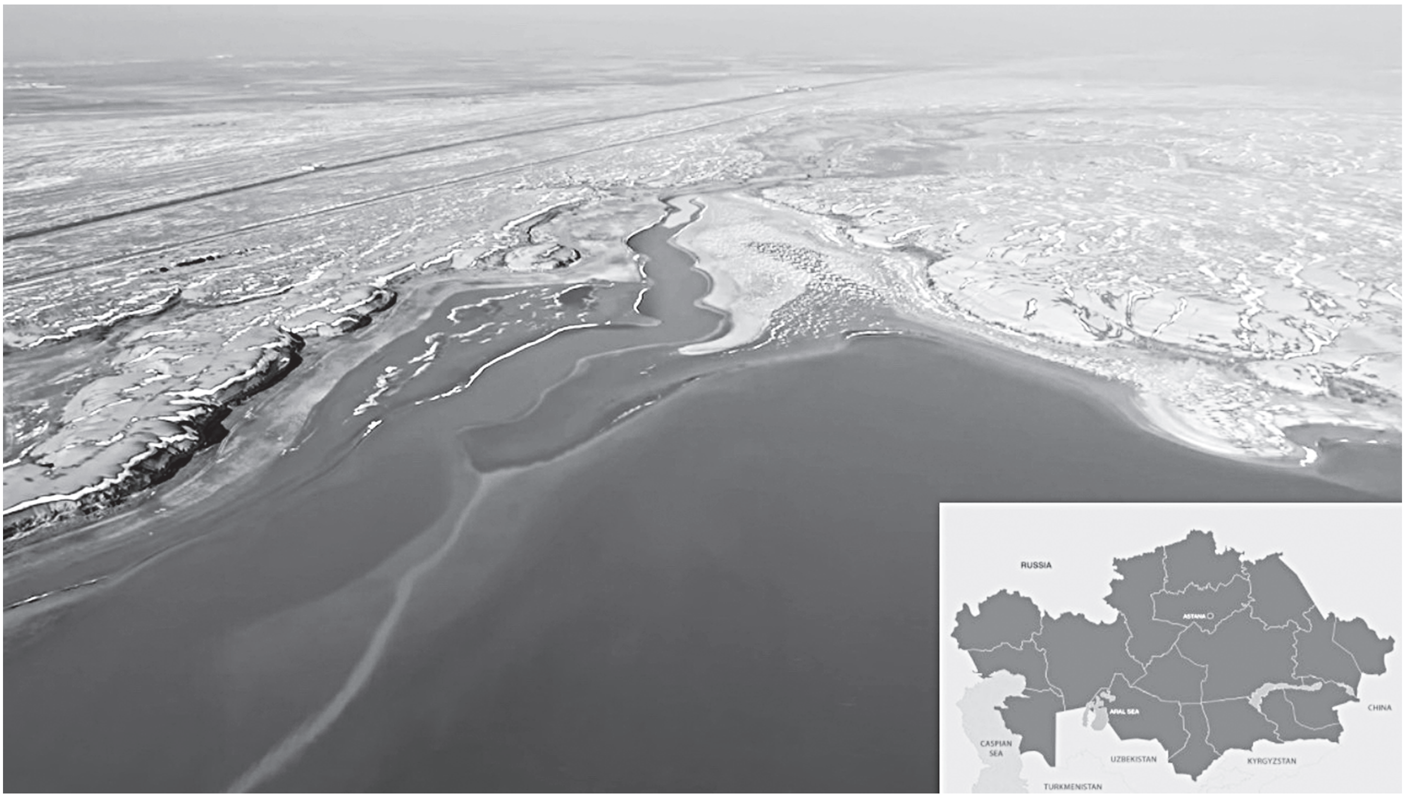

আরল সাগর বিপর্যয়

নামেই সাগর। আরল সাগর আসলে একটি হ্রদ। আয়তন ৬৮০০০ বর্গ কিলোমিটার। বিশাল আয়তনের জন্যেই হ্রদটিকে বলা হয় সাগর। আরল সাগরের অবস্থান মধ্য-এশিয়ার দুই দেশ কাজাখস্তান ও উজবেকিস্তানের যথাক্রমে দক্ষিণ ও উত্তর অংশে। তুর্কি ভাষায় আরল শব্দের অর্থ দ্বীপ। শোনা যায় একসময় এই হ্রদে ১১০০-র বেশি দ্বীপ ছিল। ভূবিজ্ঞানীদের অনুমান প্রায় ২৬ লক্ষ বছর আগে সেই দুই দেশের মাঝখানে একটি বিশাল গর্তের সৃষ্টি হয়। তারপর শিরদরিয়া ও আমুদরিয়া নদীর জলে গর্তটি ভর্তি হয়ে হ্রদের আকার ধারণ করে।

নদীর পাড়ে সৃষ্টি হয় রিপারিয়ান বন। সেখানে জল ও স্থলের সহাবস্থান। রুক্ষ জায়গায় এই ধরনের বাস্তুতন্ত্রের নাম তুগে বা তুগাই। এটি তাইগা বনাঞ্চল থেকে আলাদা। তাইগা ঠান্ডা অঞ্চলে দেখা যায়। গাছপালার ঘনত্ব সেখানে বেশ কম। বৃষ্টিপাত না হলেও তাইগা বনাঞ্চলে বছরে একটা সময় বন্যা হয়। তুগাই বাস্তুতন্ত্র চিন, পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যের অনেক জায়গায় দেখা যায়।

টিগ্রোভায়া বাল্কা একটি তুগাই বন। একইসঙ্গে পাহাড়ি ও মরুভূমির পরিবেশে এখানে দেখা যায় পপলার, বুনো জলপাই গাছ আর বড় বড় ঘাস। আগে এই বনে ছিল কাস্পিয়ান অঞ্চলের বাঘ। এখন থাকে ব্যাকট্রিয়ান হরিণ, ডোরাকাটা হায়না, সোনালি শেয়াল, জলাভূমির বেড়াল, বুনো শুয়োর, পাতিহাঁস, বাজপাখি, সারস, পানকৌড়ি, দাঁড়কাক ছাড়াও আরো অনেক প্রাণী। বনের মধ্য দিয়ে দক্ষিণে বয়ে চলে বখশ নদী। আফগানিস্তান ও তাজিকিস্তানের সীমান্তে সেই নদী মিশে যায় পাঞ্জ নদীর সঙ্গে। সৃষ্টি হয় আমুদরিয়া। আগে এই নদীর নাম ছিল অক্সাস। প্রায় ১৪১৫ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে আমুদরিয়া মেশে আরল সাগরে। শিরদরিয়ার সঙ্গে আরল সাগরের দেখা হয় সেটির উত্তর-পূর্ব পাড়ে। কিজিলকুম মরুভূমির উপর দিয়ে দুই নদীর গতিপথ। মরুভূমিতে দেখা যায় নানারকম প্রাণী। প্রাণবৈচিত্র আরল সাগরেও।

মধ্য-এশিয়ার ৫টি দেশ কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, কিরঘিজস্তান, তাজিকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তান একসময় রুশ সাম্রাজ্য বা রাশিয়ার অংশ ছিল। সেই সাম্রাজ্যের শাসককে বলা হত জার। জারের আমলে একসময় রাশিয়ার কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে লাগে শিল্পায়নের ছোঁয়া। ১৯ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মস্কো শহরে বস্ত্রশিল্পের বেশ উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। তুলো আসত প্রধানত মধ্য-এশিয়ার উজবেকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তান থেকে। আমেরিকা থেকেও তুলো আমদানি করা হত। ১৮৬১ সালে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ শুরু হলে সে দেশ থেকে রাশিয়ায় তুলো রপ্তানি বহুদিন বন্ধ থাকে। চাহিদা মেটাতে রাশিয়া তখন ভারত ও মিশর থেকে তুলো আমদানি শুরু করে।

জার আমলে জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেও ভাল ছিল না। সম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে। ফলে মানুষের মধ্যে বাড়তে থাকে অসন্তোষ। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর লেনিনের নেতৃত্বে জারতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে ক্ষমতায় আসে বলসেভিক পার্টি। সৃষ্টি হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। একটি দেশ বা সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র যার লক্ষ্য শ্রেণিবৈষম্য দূর করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নতি ঘটানো। এর জন্য প্রয়োজন ব্যাপক কর্মসংস্থান ও শিল্পায়ন।

গৃহযুদ্ধের শেষে আমেরিকা থেকে তুলো আবার রাশিয়ায় আসতে শুরু করে। সোভিয়েত যুগেও বহু বছর তা অব্যাহত ছিল। দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধের পর দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হলে বস্ত্রশিল্পের জন্য কাঁচামালের অভাব মেটাতে স্ট্যালিনের উদ্যোগে মধ্য-এশিয়া অঞ্চলে তুলো চাষ প্রচুর বেড়ে যায়। চাষের জন্য নদীগুলো থেকে জল প্রচুর পরিমাণে খালের মাধ্যমে বের করে নেওয়া শুরু হলে আরল সাগরে জলের পরিমাণ কমতে থাকে। চাষের জমি থেকে আসা প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক মেশানো জল হ্রদে পড়ায় আয়তন কমার সাথে সাথে হ্রদের জল হয়ে ওঠে মারাত্মক দূষিত ও লবণাক্ত। একসময় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জেগে ওঠে হ্রদের তলদেশ। ধীরে ধীরে সেখানে জমে থাকা লবণ ও ক্ষতিকারক রাসায়নিক উপাদানগুলো শুকিয়ে বিষাক্ত ধুলোয় পরিণত হয়।

আরল সাগর এখন নিজেরই দুটি ছোট ছোট অংশ ছাড়া আর কিছু নয়। একটি উত্তর আরল সাগর। অন্য অংশের নাম দক্ষিণ আরল সাগর। যেটির বেশিরভাগই উজবেকিস্তানে। কাজাখস্তান ও উজবেকিস্তানে আরল সাগরের তীরে একসময়কার দুটি বিখ্যাত শহর যথাক্রমে আরলস্ক ও ময়নাক। সেখানকার মানুষের প্রধান জীবিকা ছিল মাছ ধরা। সেইসঙ্গে চাষবাস ও পণ্য পরিবহণ। ময়নাক শহরেই থাকতেন প্রায় ৩০০০০ মানুষ। সাগর এখন সরে গেছে অনেক দূরে। উজবেকিস্তানের ষষ্ঠ বৃহত্তম শহর নুকুস থেকে মরুভূমির উপর দিয়ে ২০০ কিলোমিটার পেরিয়ে আসা যায় ময়নাক। তারপর আরো ১০০ কিলোমিটার এগোলে চোখে পড়ে দক্ষিণ আরল সাগর। জলের অভাব, অনাবৃষ্টি ও অতিরিক্ত বাষ্পায়নের ফলে আরল সাগরের এই অংশে জল অস্বাভাবিক নোনা। জলে দেখা যায় প্রচুর পরিমাণে ফেনা। চারদিকে অস্বস্তিকর দুর্গন্ধ। প্রকৃতিকে মানুষ যেভাবে ধ্বংস করে চলেছে, আরল সাগরের এই অবস্থা তারই একটা জ্বলন্ত প্রমাণ। অনেকেই আসেন মানুষের তৈরি বিপর্যয়ের নিদর্শন হিসাবে দক্ষিণ আরল সাগরকে দেখতে।

ময়নাক শহর এখন প্রায় পরিত্যক্ত। মাঝে-মাঝেই সেখানে ওঠে বিষাক্ত ধুলিঝড়। জীবন এখানে দুর্বিষহ। মারণ ধুলোয় মানুষের নানা রোগ হয়। ঘাসেও তার প্রভাব। সেই ঘাস খেয়ে মারা যায় অনেক গবাদি-পশু। ময়নাকের রুক্ষ ভূমিতে এখন দাঁড়িয়ে আছে মরচে ধরা অনেক জাহাজ। একসময় সেগুলো ভেসে বেড়াত বিশাল আরল সাগরের জলে। ময়নাক সংগ্রহশালায় রয়েছে পুরানো দিনের অনেক স্মৃতি। ছবিতে দেখা যায় এখানকার আগের পরিবেশ। ধুলো, ঝড় আটকাতে উজবেকিস্তানের কারাকালপাকস্তান অঞ্চলে বন বিভাগের উদ্যোগে ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে হ্যালোজাইলন গোত্রের গুল্মজাতীয় অসংখ্য সাক্সল গাছ লাগানোর কাজ। তাতে যদি অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়।

তবে চেষ্টা করলে অনেক বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। উত্তর আরল সাগরকে স্বমহিমায় ফিরিয়ে আনতে ২০০৫ সালে কাজাখস্তানে তৈরি হয়েছে কোক-আরল বাঁধ। প্রায় ১৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এই বাঁধের জন্য কয়েক বছরের মধ্যেই আরল সাগরের এই অংশের জলতল অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। নোনাভাব কমে যাওয়াতে জলে ফিরে আসে অনেক প্রজাতির মাছ। আরলস্কে মৎস্যজীবিদের মধ্যে এখন খুশির জোয়ার। পেছনে ফিরে তাকানোর কোন প্রয়োজন নেই। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি তুলো উৎপন্ন হয় ভারতে। এই ব্যাপারে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে উজবেকিস্তান। আমুদরিয়ার জল আরল সাগরের দক্ষিণ অংশে আর পৌঁছায় না। মহাকাশ থেকে নাসার ক্যামেরায় একের পর এক ধরা পড়েছে আরল সাগরের বিপর্যয়ের ছবি। এরকম চললে দক্ষিণ আরল সাগর পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সেদিনটি বোধহয় খুব বেশি দূরে নেই।

লেখক বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক • *M. 9231835703*

জয়শ্রী দত্ত

ঝাড়ু গাছ

গাছের নাম ঝাড়ু গাছ বললে অবাক লাগে নিজের মনেই। ইংরেজিতে একে বলে Whisk-fern. পাওয়া যায় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অরণ্যে। বনের ভেতর গোছা ধরে হয়ে থাকে এই গাছ। এর বিজ্ঞানসম্মত নাম : Psilotum nudum, গোত্র : Psilotaceae Psilotum, শব্দটা গ্রীক শব্দ 'Psilos' থেকে এসেছে। এর মানে 'মসৃণ'। মসৃণ কাণ্ডের জন্যই এই নাম। 'nudum' শব্দটা এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'nudus' থেকে। এর অর্থ 'naked'। আবরণহীন কাণ্ডের জন্যই এই নাম।

সোজা ফার্ণের মতো দেখতে গাছগুলো একসঙ্গে গোছা ধরে হয়, লম্বায় ২০-৫০ সেমি. পর্যন্ত হতে পারে। কাণ্ডটা বারবার দু-ভাগে ভাগ হয়ে যায়। মাটির তলার কন্দটাও ভাগ হয়ে গোছা ধরে একসাথে থাকে। শল্কের মতো পাতাগুলি ১-২.৫ মিমি. হতে পারে। এতে কোনো শিরাবিন্যাস নেই। ছায়াময় পরিবেশে গাছটা জন্মায়। জলের পরিমাণও কম আর বৃদ্ধির হারও কম। গাছটা বহুবর্ষজীবী।

মাটির তলার কন্দগুলি ছত্রাকের সঙ্গে সিমবায়োটিক সম্পর্ক তৈরি করে। ছত্রাকগুলিকে এন্ডোফাইটিক মাইকোরাইজা বলে। রাইজোমের সাহায্যে এরা সম্পূর্ণ জল ও পুষ্টি শোষণ করতে পারে না। ঐ ছত্রাকগুলি কন্দগুলিকে দেয় প্রয়োজনীয় জল ও পুষ্টি, বিনিময়ে কন্দগুলি দেয় টিঁকে থাকা আর বেঁচে থাকার নিশ্চিত জায়গা।

বনে জঙ্গলে গাছটা জন্মালেও একসময় জাপানে এটা বাগান সাজানোর গাছ হিসাবে ব্যবহার করা হত। বিশেষত ইডো রাজত্বের সময় (Edo period 1603-1867) এটা জাপানি বাগানে এটা খুব ব্যবহার করা হত। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জগুলোতে প্রচুর পরিমাণে এর স্পোর সংগ্রহ করা হত। এই স্পোর ওরা ট্যালকম পাউডার হিসাবে ব্যবহার করত।

পেটের গন্ডগোলেও এই স্পোর ওষুধ হিসাবে কাজ করে। অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল রাসায়নিক হিসাবেও এটা গুরুত্বপূর্ণ।

বন জঙ্গল থেকে তুলে নেওয়ার ফলে এটা এর স্বাভাবিক বাসস্থানে ক্রমশ কমে যাচ্ছে।

সোমা সরকার

ট্যালি মার্ক

ইজারো এমনভাবে ছুটছিল যেন তাকে বাতাসের আগেই পৌঁছোতে হবে। এটা সেই সময়ের কথা যখন মানুষ তার স্থায়ী বাসস্থান গড়ে তুলতে পারেনি। এই গল্পে ইজারো হল একটি জনজাতি গোষ্ঠীর ছোটো ছেলে যে কিনা কানে শুনতে পায় না আর কথাও বলতে পারে না। কিন্তু সে পারে দৌড়ে একটি চিতাকেও হার মানাতে। তখনকার সময়ে এই রকম একদল মানুষ যাকে আমরা গোষ্ঠী বলতে পারি, তাদের কাছে ইপিকোর মতো খুব দ্রুত ছুটতে পারা একজন সদস্যের খুবই প্রয়োজন ছিল। কারণ এক জায়গায় অনেকদিন থাকতে থাকতে তাদের খাদ্যের অভাব আরম্ভ হত। তখন সবুজ, আর্দ্র, ফলন্ত গাছে ভরা এবং খুব কাছেই নদী বইছে এমন জায়গা খুঁজে বের করার জন্যে একজনকে আগে আগে ছুটে যেতে হতো। কারণ খুব বড়ো বিপদ যেমন বিশাল কোনো জন্তুর সম্মুখীন হ'লে যেন সেই কথা সে দ্রুত ফিরে এসে গোষ্ঠীর সকলকে জানাতে পারে এবং গোষ্ঠীপতি সেই দিকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত বদল করেন।

কিন্তু আজকে আমাদের গল্প ইজারোকে নিয়ে নয়। এ গল্প আরো কয়েক শত বছর এগিয়ে যখন ইজারোর বেশ কয়েক পুরুষ পার করে আমরা এসেছি এমন একটা সময়ে যখন মানুষ চাষবাস, পশুপালন করে স্থায়ী ঘরবাড়ি তৈরি করতে শিখে ফেলেছে। ইজারোরই এক বংশধর সায়াম ছিল তার মতোই মূক ও বধির। কিন্তু তার পেশা হিসেবে না ভালো লাগতো চাষবাস না ভালো লাগতো পশুপালন। শারীরিক অক্ষমতার জন্যে সে কোনো খুচরো ব্যবসাও করতে পারছিলো না। অনেক ভেবে ভেবে সে একটা বুদ্ধি বের করল। আচ্ছা ! এমন কিছু কী করা যায় যার মাধ্যমে তার গ্রামের মাঠেঘাটে কাজ করা খেতমজুর শ্রেণির লোকেদের দিনের শেষে ক্লান্তি দূর করা যায় আবার তার দু'পয়সা উপার্জনও হয়। যেমন ভাবনা তেমনি কাজ। একদিন সে ছুটে চলে যায় ওক গাছের গভীর অরণ্যে। তারপর একটা মোটা ওক গাছ কেটে বেশ কয়েকটা চৌকো সিটের কাঠের টুল, কয়েকটা গোল সিটের টুল আর কয়েকটা ত্রিকোণাকার টুল তৈরি করে। তারপর সে কয়েকজন ভালো গানবাজনা জানে এমন লোক খোঁজ করে নিয়ে আসে। আর বাইরের দিকের একটা ঘরে গ্যালারির মতো ক'রে একদম সামনে চৌকো টুল, তার পিছনে গোল টুল আর শেষ লাইনে ত্রিকোণাকার টুলগুলিকে সাজায়। সেই সঙ্গে সে বিভিন্ন ফলের তৈরি কিছু সুরার ব্যবস্থাও করে। প্রথম দিন সে বড়ো সাইজের দুটি সুরা ভর্তি পিপে কিনে আনে আর ঘুরে ঘুরে তার এই ব্যবস্থার কথা সকলকে জানিয়ে দেয়। সেদিন সন্ধ্যায় প্রায় জনা পাঁচেক লোক আসে আর প্রত্যেকে একাধিক গ্লাস পানীয় খেতে থাকে। সায়াম জানিয়ে দেয় যে গান শোনার জন্য কোনো দাম দিতে হবে না ঠিকই, কিন্তু সুরাপানের জন্য নির্ধারিত দাম দিতে হবে। সেদিন সায়ামের দুই পিপে সুরাই শেষ হয়ে গেল। পরদিন সে গতদিনের সুরা বিক্রির টাকা দিয়েই দ্বিগুণ পরিমান সুরা কিনল আর ভিড় সামলাতে পারবে না আন্দাজ ক'রে তার কয়েকজন বন্ধুকে সাহায্যের জন্যে ডেকে আনে। প্রত্যেক খরিদ্দার কে কত গ্লাস পানীয় খাচ্ছে সেটা লক্ষ্য রাখার জন্যে সে তার বন্ধুদের হিসেব রাখতে বলে। সারাদিন অমানুষিক খাটুনির পর গ্রামের লোকেদের এই আনন্দময় পরিবেশ যেন সমস্ত ক্লান্তিকে শুষে নিতে থাকে। দিনে দিনে সায়ামের এই আসর জমতে থাকে। ধীরে ধীরে তার পানশালায় লোকের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। কিন্তু যাদের হিসেব রাখতে বলা হয়েছিল তাদের কাছে এই কাজটি কঠিন থেকে কঠিনতর মনে হতে লাগলো। কারণ একেক জন একাধিক, এমনকি ছয় সাত গ্লাস পানীয়ও খেতে থাকল। একদিন হলো কী কাজাকি নামের একটি লোক পাঁচ গ্লাস সুরা খেয়ে দাম দেবার সময় বলে যে সে তিন গ্লাসের বেশি খায়নি। সায়াম তো হিসেব রাখছিল, সে ভালোই বুঝতে পারছিল যে কাজাকি এতোটা সুরা গিলেছে যে তার কিচ্ছু মনে নেই। এক কথা দু'কথা হতে হতে পরিবেশ বেশ গরম হয়ে ওঠে। দু'চার জন যারা পাশথেকে তর্ক শুনছিল, তারা এই হিসেবের গন্ডগোল দেখে তাদেরকেও এই ভাবে ঠকানো হচ্ছে--এই কথা বলাবলি শুরু করল। সায়াম বিপদ বুঝে আর উচ্চবাচ্য না ক'রে তিন গ্লাসের দামই চুপচাপ নিয়ে নিল। কিন্তু দিন দিন এই হিসেবের গরমিল বাড়তে শুরু করল। তখন সায়াম ভাবল যে একটা বুদ্ধি বের করতেই হবে যাতে হিসেব নিয়ে খরিদ্দারদের কোনো সন্দেহ না থাকে। অনেক ভেবে তার মাথায় একটা মতলব এলো। সে পরদিন ভোরবেলা ছুটে গেল আবার সেই ওকের বনে। একটা বড়ো ওক গাছ কেটে বিশাল আকারের একটা বোর্ড বানালো। সেখানে খোদাই করে দুটো স্তম্ভ আর তার পানশালায় যতগুলি বসার জায়গা আছে ততগুলি সারি তৈরি করলো। প্রথম স্তম্ভে সবগুলি বসার জায়গা চিহ্নিত করল।

এবার করল কী কয়েকজন বন্ধুকে সেই বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে বলল। ঠিক হ'ল এখন থেকে যে ব্যক্তি একগ্লাস করে সুরা খাবে, বোর্ডে তার সিটের পাশের স্তম্ভে একটা করে ছোটো লম্বা খাড়া দাগ দেওয়া হবে। সে যখন আবার দ্বিতীয় গ্লাস নেবে তখন সেই দাগের পাশে আর একটা দাগ দিতে হবে। এই ভাবে প্রত্যেকের সিটের পাশে একটা একটা করে দাগ বসতে থাকবে। নীচের ছবিতে বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

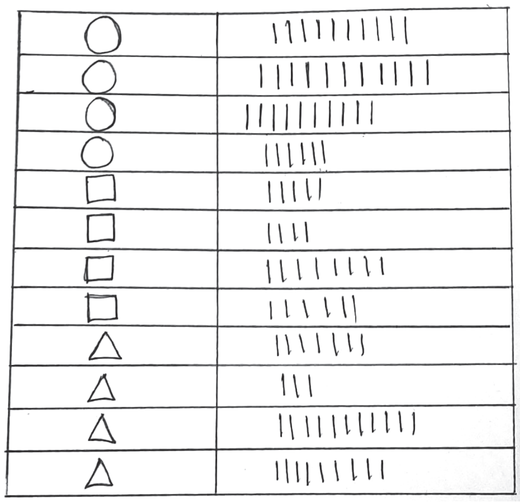

এবার বাড়ি ফেরার সময়ে সবাই পর পর দাঁড়াতো আর একেক জনের দাগের সংখ্যা গুনে গুনে দাম ধরা হতো। এতে প্রথমত সমস্যা মিটছিল ঠিকই। কারণ মালিক ঠকিয়ে বেশি গ্লাসের দাম নিচ্ছে এই অপবাদের হাত থাকে সায়াম মুক্তি পেয়েছিল। কিন্তু গোল বাঁধল অন্য জায়গায়। প্রত্যেকের মাথাপিছু গ্লাসের সংখ্যা আট নয় ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। কারণ অনেকেই সঙ্গে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন নিয়ে আসতে শুরু করলে হিসেব রাখা একটু কঠিন হয়ে পরছিল। কেউ হয়তো চার জনের দাম দেবে।

তখন সেই ব্যক্তির গ্লাসের সংখ্যা যোগ করে করে গুনতে বেশ সময় লাগছিল। এদিকে এই মাঠেঘাটে খামারে কাজ করা শ্রমিক একেতেই সারাদিন কাজ করে ক্লান্ত হয়ে থাকত তার উপর আকণ্ঠ সোমরস গিলে তাদের লাইনে দাঁড়করিয়ে রাখা একরকম শাস্তির মতো হয়ে যাচ্ছিল। যাই হোক প্রথম প্রথম ক'দিন এই ভাবে ভালোই চলছিল, কিন্তু শেষমেষ একদিন একটা বড়ো ঝামেলা লেগেই গেল। লাইনের পিছনের দিক থেকে সেই কাজাকি নামের লোকটি সামনের লোকজনদের ঠেলেঠুলে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছিল। যাকে টপকে আসার চেষ্টা করছিল সে মানবে কেন। সে তো কাজাকিকে দিল এক ঘুষি! তারপর সে কী বিশাল ঝামেলা! সায়াম বুঝে গেল এই ব্যবসা চালাতে হলে তাকে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে টাকা নেওয়ার সময় খরিদ্দারদের বেশিক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে না হয়। সে জানত যে আমাদের চোখ একনজরে ৪ থেকে ৫ এর বেশি জিনিস গুনতে পারে না। আর এখানে তো আট-নয়, কারো কারো বারো-তেরোটা দাগও গুনতে হচ্ছে। তাই সে প্রত্যেক সিটের সাপেক্ষে যে দাগ দিয়েছিল, সেখানে চারটা দাগের পর পাঁচ নম্বর দাগটা পাশাপাশি না বসিয়ে অনুভূমিক ভাবে যেন বা চারটা কাঠিকে বেঁধে রেখেছে এই ভাবে বসালো। এবার পাঁচটা কাঠির যে সেট তৈরি হ'ল, সেটা গোনা অনেক সহজ এবং তাড়াতাড়ি হ'ল। ব্যাপারটা এই রকম, ধরুন কারুর হেডে চোদ্দটা গ্লাস আছে। তাহলে তার সিটের পাশে দুটো পাঁচ-এর সেট এবং চারটা দাগ থাকবে। সুতরাং এই গোনাটা তুলনামূলক ভাবে অনেকটা সহজ হল। কারণ এক নজরেই দুটো পাঁচ-এর সেট দশ আর চারটে কাঠি মিলে চোদ্দ,এমনভাবে গোনা যায়। পাশে দেখানো হয়েছে কীভাবে ছবিটা তৈরি হয়েছে।

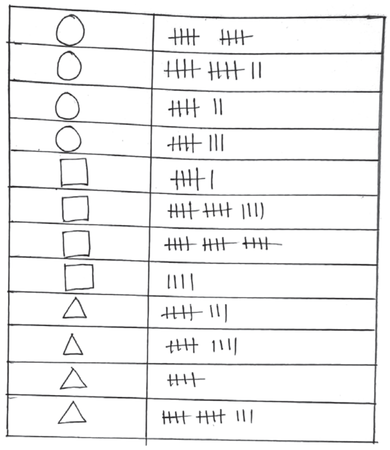

এবার সায়াম অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'ল। কারণ শেষ বেলায় পানশালা বন্ধের আগে সে খুব তাড়াতাড়ি খরিদ্দার বিদায় করতে পারছিল। টাকা জমার লম্বা লাইনও আর হচ্ছিল না আর সায়ামের ব্যবসার বহরও বেড়ে উঠছিল চোখে পড়ার মতো করে।

লেখিকা অংকের শিক্ষিকা *M. 9382872243*

শ্রীমতী রিংকু দাস

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান

সাইফন কিভাবে কাজ করে

সাইফন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে কোন তরলকে এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে স্থানান্তরিত করা যায় পাত্র দুটিকে কোনভাবে কাত না করে। এটি বায়ুর চাপ ও তরলের চাপের নীতির ওপর কাজ করে। আমাদের ফ্লাশ টয়লেটে এই সাইফন প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়।

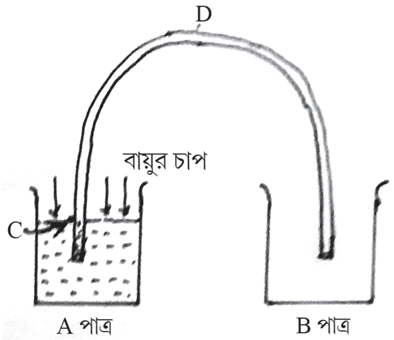

ধরা যাক হাফ মিটার লম্বা একটি লেভেলিং পাইপ নেওয়া হল আর দুটি পাত্র নেওয়া হল যার একটিতে জলতলের উচ্চতা অন্যটির তুলনায় বেশি। এবার পাইপটিকে (চিত্র ১) A পাত্রের জলে ডোবালে পাইপটিতে জল ঢুকবে, যতক্ষণ না পাত্রের জলতল ও পাইপের জলতার একই উচ্চতায় পৌঁছায় (এক্ষেত্রে পাইপের মধ্যে থাকা বাতাসকে অপসারিত করে জল পাইপে ঢোকে)। পাইপটিতে C বিন্দু পর্যন্ত জল ঢোকার পর আর জল ঢুকবে না কারণ পাইপের বাকি অংশে বায়ু থাকার জন্য বায়ু জলকে ঢুকতে বাধা দেবে। এবার যদি পাইপের বাকি অংশ থেকে বাতাস বের করে নেওয়া হয় তাহলে পাইপের মধ্যে একটি নিম্নচাপ সৃষ্টি হয় (চিত্র ২)।

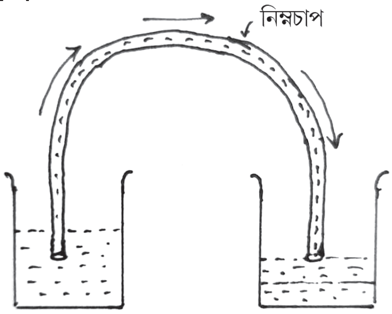

তখন পাইপের মধ্যে দিয়ে জল অভিকর্ষের বিপরীতে উঠতে শুরু করে এবং পাইপ এর সর্বোচ্চ বিন্দু (D)-তে পৌঁছে যায়। দেখা গেছে এইভাবে বায়ুর চাপ জলকে ঠেলে অভিকর্ষের বিপরীতে প্রায় ১০.৩ মিটার পর্যন্ত ওপরে উঠাতে পারে।

পাইপের সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছাবার পর জল অভিকর্ষের টানে নিচের দিকে পড়তে শুরু করে। একবার জল নিচের দিকে পড়তে শুরু করলে জলের প্রবাহ ততক্ষণ চলতে থাকে যতক্ষণ না দুই পাত্রে জলতল একই উচ্চতায় আসে। এটা অনেকটা একটা পুলির দুদিকে ঝোলানো ওজনের মত কাজ করে।

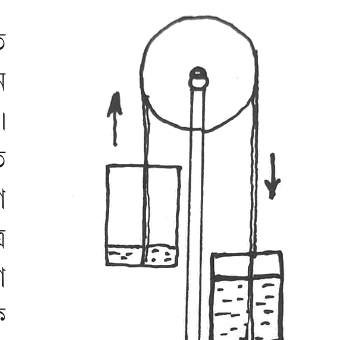

লেখিকা পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষিকা ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক
e-mail: dr.sunandarinkudas@gmail.com • M. 9163948267

দ্যুতি সরকার

মোটর ইঞ্জিন ভ্যান

মানুষের একটি মৌলিক কর্তব্য হল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে আরও সুন্দর করা এবং প্রাণীজগৎ সহ উদ্ভিদজগতের অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখা। এর জন্য বিভিন্ন দেশের সরকার বিভিন্নরকম প্রচেষ্টা করছে।

বিগত বেশ কিছু বছর ধরে গ্রামবাংলা তথা সারা দেশের একটি অতিপরিচিত পণ্য এবং যাত্রী পরিবহনকারী যান হল ইঞ্জিন ভ্যান বা মোটর ভ্যান (চলতি কথায় যাকে 'ভ্যানো' বলে) যার অস্তিত্ব সরকারি খাতায় কলমে না থাকলেও বাস্তবে আছে। এই সকল ভ্যান থেকে নির্গত কিছু দূষক, যেমন— নাইট্রোজেন অক্সাইড (NOX), কার্বন মনোক্সাইড (CO), কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2), হাইড্রো কার্বন ইত্যাদির কারণে মানুষ সহ বিভিন্ন প্রাণীর ফুসফুস, মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ডের ব্যাপক ক্ষতি হয়। পরিবেশও অত্যন্ত দূষিত হয়। সরকারি নিয়মানুসারে ইঞ্জিন-চালিত প্রায় সব গাড়িতেই নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ধোঁয়া থেকে নির্গত দূষকের পরিমাণ জানার জন্য ধোঁয়া পরীক্ষা করতেই হয়। কিন্তু এই ভ্যানগুলি তা করে না, কারণ তাদের সংখ্যা এবং অস্তিত্ব সম্পর্কিত তথ্য প্রশাসনিক খাতায় নথিভুক্তই নেই। যদি প্রশাসনিক দিক থেকে এই যানবাহনটির সংখ্যা কমিয়ে আনা যায়, তবে আমাদের দেশটা হয়তো পরিবেশ দূষণের হাত থেকে অনেকটাই বাঁচবে। কিন্তু এই কথাটা বলা যতটা সহজ, বাস্তবে ততটা নয়। এর কারণ হল, যে সকল মানুষের জীবন-জীবিকা নির্ভর করছে এই যানবাহনটির ওপর, তাদের কথাও ভাবতে হবে।

এখানে প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, এই মানুষগুলোই বা এত সব জীবিকা ছেড়ে এই কালো ধোঁয়া সৃষ্টিকারী মোটর ভ্যান বা ইঞ্জিন ভ্যান-এর উপর নির্ভরশীল জীবিকাকেই বাছলেন কেন? এর প্রথম কারণ হতে পারে, এই ভ্যানের দাম অন্যান্য যানবাহনের তুলনায় কম। দ্বিতীয়ত, এই ভ্যান চালাতে কোনও লাইসেন্স এর প্রয়োজন হয় না। এই ভ্যানগুলি যেহেতু ডিজেল-এ চলে, আর ভারতে ডিজেল এর দাম যেখানে প্রায় ৯০ টাকা, পেট্রোল সেখানে ১০০ টাকার বেশি, সেহেতু এইদিক থেকে ভেবে দেখলে এই গাড়িটির অধিক ব্যবহার ও জনপ্রিয়তার কারণটি বোঝা যায়। কিন্তু এই গাড়িটি এত সাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও কি ব্যবহারের উপযোগী? এর উত্তর, না। প্রধান কারণ এর ব্রেকিং সিস্টেম অনুন্নত। তাই পথ দুর্ঘটনা যখন তখন ঘটতেই পারে। এটা প্রায়ই দেখা যায়, এই অনুন্নত ভ্যান নিয়ে ভ্যান-চালকরা জাতীয় সড়ক বা রাজ্য সড়কে চলে আসছেন। ফলে সিগনাল দেখে সঠিক সময় ব্রেক কষতে না পারায় পথ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা ক্রমশ বাড়ছে। এর ফলে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

ভ্যান-এর এসব ক্ষতিকারক দিক বিচার করে যদি প্রশাসন এদের বর্তমান জীবিকা অর্থাৎ মোটর ভ্যানে করে যাত্রী বা মালপত্র পরিবহন বন্ধ করে দেয়, তাহলে এই মানুষগুলির জন্য নতুন জীবিকার সন্ধান দেওয়ার দায়িত্বও প্রশাসনেরই থাকবে। এই পরিস্থিতিতে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে সরকার, যেমন— এই ভ্যান চালকদের অন্য কিছু চালানোর জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া; সেটা লরি, বাস বা ব্যাটারি-চালিত যে কোনও গাড়ি হতে পারে। সেক্ষেত্রে সরকারকে ব্যাটারি-চালিত গাড়ির (EV) বা ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল) সংখ্যা অন্যান্য গাড়ির তুলনায় বাড়াতে হবে। এর পিছনে যুক্তি হল, ব্যাটারি-চালিত গাড়ি নির্মাণের সময় দূষক নির্গত হলেও পরবর্তীকালে এই গাড়িগুলি যখন চলে তখন, তা থেকে কোনওরকম দূষণের সৃষ্টি হয় না। অবশ্য এই ভ্যান-চালকদের গাড়ি চালানো ছাড়াও নিশ্চয়ই অন্য কোন জীবিকা হতে পারে, যেমন— বিভিন্ন রকম ব্যবসা বা ছোটখাটো চাকরি। এর পাশাপাশি এই সকল ভ্যান-চালকদের যদি স্বল্প সুদে অটো কেনার ঋণ দেওয়া হয়, তবে তাদের যান চালানোর পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে। তারা স্বাধীন একটি জীবিকাও পাবে। এখন এটাও ভাবার বিষয়, এই ভ্যানগুলো সব বাতিলের খাতায় নাম লিখলে এদের পরিণতি কী হবে? সেক্ষেত্রে বলা যায়, এদের পুনর্ব্যবহার করা যেতে পারে। যেহেতু এগুলি কাঠের তৈরি, তাই ভ্যানটির ওপরের অংশের মূল কাঠামোটিকে আলাদা করে ঠেলা গাড়ি বা পায়ে চালানো ভ্যান হিসাবে স্বল্প দূরত্বের পণ্য পরিবহনের কাজে সহজেই ব্যবহার করা যেতে পারে।

সুনাগরিক হিসেবে তাই আমাদের কর্তব্য হল, পরিবেশ থেকে দূষণকারী মাধ্যমগুলিকে চিহ্নিত করে তাদের নিয়ন্ত্রণে আনা, যাতে কোনওভাবেই জীবজগতের কোনও ক্ষতি না হয়। পরিবেশ যাতে আরও সবুজ ও স্বাস্থ্যকর হয়ে উঠতে পারে।

লেখিকা অষ্টম শ্রেণি, চুঁচুড়া বালিকা বাণী মন্দির, চুঁচুড়া, হুগলি

e-mail: paulami091@gmail.com • M. 8777021432

ড. রাজা রাউত

যারা হারিয়ে যাচ্ছে

স্তন্যপায়ী : **বানটেং**

সাধারণ ইংরাজি নাম : *Banteng*

বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Bos javanicus*

তীব্রভাবে সংকটাপন্ন একটি গাভী প্রজাতি। এটিকে 'টেম্বাডউ' নামেও ডাকা হয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। এরা গৃহপালিত গরুর থেকে সামান্য বড় ও ভারী জাতের বুনো প্রাণী। এদের মধ্যে যৌন দ্বিরূপতা খুব সুস্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা যায়। এরা সাধারণত দিবারাত্রি উভয় সময়কালে সক্রিয়তা দেখায়। প্রধানত জাভা, কম্বোডিয়া এবং থাইল্যান্ডে—পাওয়া যায় ভারতের বাইরে। আমাদের দেশে মিজোরাম-এ দেখা গেলেও বহু দশক আগেই—এখান থেকে লুপ্ত। এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় ক্লোনে সফল স্তন্যপায়ী প্রজাতি।

সরীসৃপ : **ভারতীয় বহুরূপী**

সাধারণ ইংরাজি নাম : *Indian Chameleon*

বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Chamaeleo zeylanicus*

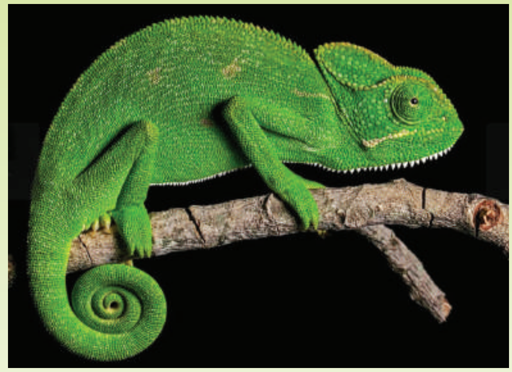

ভারত ছাড়াও শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কয়েকটি স্থানে দেখা যায়। এদের অদ্ভুত কিছু স্বভাবের মধ্যে গায়ের রং বদলানো, আঁকড়ে ধরার মত লেজ, ৩৬০ ডিগ্রি কোণে ঘোরাতে পারা চোখ এবং দীর্ঘ আঠালো জিহ্বা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতে মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে সাধারণত এদের দেখা যায়। আজ এরা দুর্লভ প্রজাতি।

পক্ষী : **মদন টাক**

সাধারণ ইংরাজি নাম : *Lesser Adjutant Stork*

বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Leptoptilos javanicus*

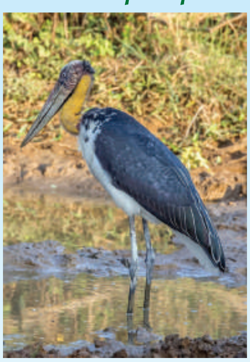

এদের গলা ও মাথায় কোন পালক থাকে না। মোটামুটি সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পাওয়া যায়। ভারতের বাইরে নেপাল, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, লাওস, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া এবং কম্বোডিয়াতেও পাওয়া যায়। এদের সংখ্যা দ্রুতহারে কমে আসছে। সেইজন্য ২০২০ সালে এটিকে IUCN-এর রেড ডাটাবুকে বিপন্ন পাখি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, মূলতঃ আবাসস্থল ধ্বংস ও কৃষিকাজে ব্যবহৃত ব্যাপক কীটনাশক, রাসায়নিক সার—বংশ বিলুপ্তির অন্যতম প্রধান কারণ

অমেরুদণ্ডী : **বরুণ পাখা**

সাধারণ ইংরাজি নাম : Varnished Apollo

বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Parnassius acco*

এই প্রজাতির প্রজাপতি দক্ষিণ ভারত ও শ্রীলঙ্কাতে প্রধানত দেখা গেলেও একসময় সারা ভারতে পাওয়া যেত। এটি মহারাষ্ট্রের রাজ্য প্রজাপতি (২০১৫) এবং ভারতের কোন অঙ্গরাজ্যের প্রথম রাজ্য প্রজাপতির মর্যাদাপ্রাপ্ত। ভারতে যতগুলো বড় জাতের প্রজাপতি পাওয়া যায় তার মধ্যে এটি একটি। খাদ্য উদ্ভিদ ও বাসস্থান ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে এরা বিপন্ন প্রজাতিরূপে মর্যাদাপ্রাপ্ত।

লেখক বিজ্ঞানের শিক্ষক, পরিবেশকর্মী ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক। *email: rajarouthbhbl@gmail.com • M. 9474417178*

BIGYAN ANNESWAK VOL : 22 Issue No. 2 March-April 2025 RNI : WBBEN/2003/11192 Rs. 20/-
ISSN 2582-5674

ছবি : রাজা রাউত

ভারতীয় গন্ডার

Indian One Horned Rhinoceros Rhinoceros unicornis